জীবন বড় ভারবাহী জন্তু

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎ পাবলিশিং হাউস । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৩৭১

প্রকাশক
ছায়া চট্টোপাধ্যায়
১৮এ টেমার লেন, কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০০০৪

প্রচ্ছদশিল্পী
সুবোধ দাশগুপ্ত

উৎসর্গ

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

—প্রীতিভাজনেষু

লেখকের অন্যান্য বই—

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে (১ম, ২য়)

অলৌকিক জলযান (১ম, ২য়)

রাজা যায় বনবাসে

শেষ দৃশ্য

দুঃস্বপ্ন

বলিদান

সুখী রাজপুত্র

রদ্দুরে জ্যোৎস্নায়

টুকুনের অসুখ

নীলতিমি

ফেনতুর সাদা ঘোড়া

সব ফুল কিনে নাও

জীবন বড় ভারবাহী জন্তু

শেষ পর্যন্ত আপনার কথাই ঠিক রইল। গল্পের পাঁচটি অধ্যায় অথবা আমি বলি পাঁচটি অঙ্ক থেকে প্রথম অঙ্ক বাদ দিলাম। এই বাদ দেওয়া বেমালুম বাদ দেওয়া নয়, জীবনের কিছু কিছু অথবা অনেক কিছু বাদ দেওয়া। গল্পটি অনেকদিন থেকেই আপনার পত্রিকার জন্য চেয়েছিলেন। কিন্তু আমার লোভ ছিল গল্পটি অন্যত্র ছাপা হোক। অন্যত্র কথার অর্থে এখানে আমি অনন্য নগরীর কথা ভেবেছি। যেখানে নগরী তার নাগরদের নিয়ে চর্যাপদের হরিণী সেজেছে। গল্পটি সামান্য ছোট করে দেবার কথা ছিল—কিছুটা সংক্ষিপ্ত আকারে অর্থাৎ ছোট পত্রিকার জন্য ছোট আকারে গল্প হলেই ভাল হয়, দেখা হলে বলতেন, কি করলেন—তখন কেন জানি আমার কিছু বলার থাকত না। মনে হত জীবন বড় ভারবাহী জন্তু, এত সহজে ছোট করে বোধ হয় সব কিছু হয় না। আপনার ছোট পত্রিকা, ছোট পত্রিকায় বোধ হয় চিত্রকল্প ব্যবহার হয় না। গল্পের কোনো চিত্রকল্পের ব্যবহার থাকবে না ভাবতে কষ্ট লাগে।

আচ্ছা আপনি 'পুরোনো দেওয়ালের চিত্রকল্প দেখেছেন। একটা রাস্তা, পুরোনো দেয়াল, একটা মুখ। মানুষ অথবা তার প্রতিচ্ছবি। আর কিছু কিছু রেখা ফুল ফোটার মতো ফুটেছিল। অথবা 'খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর'-এর ছবি। আহা সেই মাছ, সেই চোখ, সেই সূর্য। কংক্রিটের পোল, টিনের ঘর, ছুটো টান একটি রেখা—আহা কি ব্যঞ্জনা আর ভাব। শিল্পী যেন ছুটো একটা রেখাতে জীবন কত বড় বোঝাতে চেয়েছিলেন। তেমন কোনো ছবি যদি আমার বুড়ো মানুষটির জন্য ব্যবহার করতেন।

অতীন

যেমন ছবির গোড়ার দিকে থাকুক, একটা সকাল। সূর্য উঠছে হিজলের বিলে। দূরে কোনো রেলগাড়ি দাঁড়িয়ে। লাইনটা বেঁকে বেঁকে হিজলের পাড়ে পাড়ে প্রায় দিগন্তে ঢুকে গেছে। সিগনালিং না পেয়ে রেলগাড়ি চুপচাপ নির্জন মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। অদূরে প্ল্যাট-ফরম, লাল ইটের কোয়ার্টার। ভেতরের দিকে মাঠে সাদা মতো দোতালা বাড়ির ঝুলবারান্দা থেকে হিজলের বিল, প্ল্যাটফরম, লাল ইটের কোয়ার্টার, দূরের রেলগাড়ি ছবির মতো স্পষ্ট। দোতালার ঝুল বারান্দায় বুড়ো মতো একজন মানুষ ইজিচেয়ারে শুয়ে সব দেখছেন। পাশে একটা লাঠি। শিল্পী ছবি আঁকার সময় লাঠিটা আঁকতে যেন ভুলে না যান। কারণ গল্পে বুড়ো মানুষ এবং তাঁর লাঠি উভয়ই বড় বেশি প্রতিপক্ষ। একজন না থাকলে আর একজন ঠিক ফুটে ওঠে না। গল্পের প্রথম দিকে সংক্ষিপ্ত আকারে এটুকুই আমার বলার ইচ্ছে। ছবিতো কথা বলে শুনেছি। মোদ্দা কথা, গল্প যদি ছবি সহ ছাপা হয় তবে তার চিত্রকল্প 'গ্রাম কেয়াবনের দুঃখী মানুষটির' মতো না হয়ে আমার 'স্টেশন ও সেই বৃদ্ধ মানুষটির' মতো হলে ভাল হয়।

আর গল্পের প্রথম দিককার জন্য কত সব যে মনোরম ছবি ভাবতাম। কোন ছবি কিভাবে শিল্পী আঁকবেন জানি না, তবু বার বার মনে হয়, ছবি আঁকার সময় হয় তো বুড়ো মানুষটিরই ছবি আঁকবেন। বুড়ো মানুষ সিঁড়ি ধরে নামছেন, হাতের লাঠি হাতেই আছে। দেয়ালে দুটো টিকটিকি ঝুকে রোজকার মতো দেখছে—বুড়ো মানুষটা নেমে যাচ্ছেন। বোধ হয় দোতালা থেকে হিজলের বাঁকে দেখেছেন ট্রেন আসছে। ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছেন। সদরে বকুল গাছ। গাছের নিচে এসে সামান্য সময়ের জন্য দাঁড়ানো, তারপর হাঁটা। পাশাপাশি গাঁয়ের সব মানুষ ট্রেন ধরার জন্য ছুটছে। এবং ছুটতে ছুটতে ঠিক দেখতে পায় বুড়ো মানুষ লাঠি উঁচিয়ে উঠে যাচ্ছে স্টেশনে। ওরা গড় হয়। আবার দৌড়ায়। তিনি হাতে লাঠি ঘোরান। ট্রেনের সঙ্গে স্টেশনের সঙ্গে বাবুর নাড়ীর সম্পর্ক। ভোরের ট্রেন আসছে।

চিত্রকল্পে ট্রেন না দেখালেও ক্ষতি নেই। শুধু ধোঁয়া দেখিয়েই ছেড়ে দেওয়া যেতে পারত। কারণ বুড়ো মানুষ ধোঁয়া দেখলেই টের পান গাড়ি বাজারসাহু এসে গেছে।

অথবা এইসব রঙেও ছবি আঁকা যেতে পারে। যেমন বুড়ো মানুষটি ঝুল বারান্দায় পায়চারি করছেন। লাঠিটা দোলাচ্ছেন হাতের ওপর। লাঠি আছে বলেই ঠুকে ঠুকে হাঁটার স্বভাব না। বরং লাঠিটা এ-বয়সে কিছুটা সারকাসের জোকারের মতো। না থাকলে জমে না। তখন অনেক দূরে সেই হিজলের বিল অতিক্রম করে আসছে একদল মানুষ। কাঁধে মরার খাটলি। কাঁদি পাঁচথুপি অঞ্চলের সব কারা হিজল পার হয়ে চলে আসে গঙ্গার পাড়ে। সকালে এমন একটা দৃশ্য হামেশাই থাকে। রেলিঙে দাঁড়ালে সকালের দিকে এটা চোখে পড়বেই। স্টেশনে তখন ট্রেন ইন করছে।

গার্ড বিনোদবাবু হয়তো যাচ্ছেন এ-ট্রেনে। হিজলের বিলে তিতির পড়েছে। বিনোদবাবুকে নিয়ে শিকারে গেলে হয়। মানুষটা তিতিরের মাংস খেতে খুব ভালবাসে। একবার কি কারণে—বাড়িতে তিতিরের মাংস হয়েছিল। ভারি বর্ষা, হিজলের বন্যায় সামনের লাইন-ফাইন ভাসিয়ে নিয়েছে। বিনোদবাবু আটকা পড়ে গেছিলেন, ট্রেন নিয়ে। বর্ষাকাল, ঝির ঝির বৃষ্টি, তিতিরের মাংস খেয়ে বিনোদবাবু বলেছিলেন, তুলনা নেই। সেই থেকে দেখা হলেই, কি যে খাওয়ালেন, সবাইকে গল্প করি। ভারি সুস্বাদু। এবং সুস্বাদু বলার সময় এখনও জল আসে জিভে। তিতিরের মাংস ভারি সুস্বাদু। আর একবার গেলে হয় না!

হয়, হবে না কেন। এখনতো তেমন তেল হয়নি। শীতকাল আসুক, গম যব খেয়ে তিতিরের গায়ে লাবণ্য নামে। তখন খেলে কি না জানি করতেন! কাজকামের কথা মনে থাকত না। তিতির তিতির করে হিজলের বনে হন্যে হয়ে ঘুরতেন। যাগ্‌গে একবার যাব। আপনাকে, শিকারে নিয়ে যাব। তিতিরের লোভে সন্নেসী হলে ট্রেন চালাবে কে।

মরার খাটলিটা তিনি আর তখন দেখতে পেলেন না। ওটা লাইন পার হয়ে স্কুলের ও-পাশে বড় অশ্বত্থের নিচে বোধ হয় নেমে গেছে। স্টেশনে নতুন বড়বাবু এসেছে। অন্যদিন হলে বড়বাবুর ঘরে গিয়ে বসে বলতেন, কি হে ঘোষাল তোমার পাণিপাড়ে আমার ভাব চুরি করেছে কেন? তোমার বাগানে ভাল ডালিয়া করতে পারলে না। মটর শাক খাও? খেলে কাউকে পাঠিয়ে দিও। এইসব কথাবার্তা, যেন আছেন, বেঁচে আছেন—সবাইকে দিয়ে-থুয়ে, এবং একজন মানী মানুষের মতো বেঁচে আছেন—তখন কিনা, এই সেদিনের এবারের নতুন বড়বাবু, একবার এসে দেখা করল না! এবং তিনি যে এখানে এমন একটি হিজলের বিল, আর স্টেশন, কিছু গাছপালা দেখে রয়ে গেলেন, যেন এই সবের ভেতর একদল মানুষ আছেন, বেঁচে আছেন, রঙে রেখায় তা ধরে রাখতে পারলে বড় ভাল হত। এবং মানী মানুষের সঙ্গে স্টেশনের বড়বাবু নতুন এসে দেখা করে গেল না! অহংকারে ভারি লাগে। চোখে মুখে সামান্য অপমান বোধ। ঘোষাল থাকলে অন্তত এ-সময়ে ভেতরে একবার উঁকি দিতেন—আরে আসুন আসুন। রোজকার এমন প্রীতি সম্ভাষণ, নতুন ছোকরা স্টেশন মাস্টার কি বুঝবে!. বুড়ো মানুষটার মুখ ভারি থম থম করছিল।

গল্পের ছবি এখন ইচ্ছে করলে বুড়ো মানুষটাকে নিয়ে হতে পারে, বিনোদবাবুকে নিয়ে হতে পারে—এবং কিছু পাখি উড়ছে, একটা কুকুর ঘুরে গন্ধ শুকে শুকে দিগন্তে রওনা হয়েছে—কত বিচিত্র ছবি হয়ে যায় এ ভাবে—আর শুধু বুড়ো মানুষটার ছবি আঁকলে বলেছি তো লাঠিটা হাতে থাকবেই। লাঠি মাটিতে পড়বে না। একেবারে বুড়ো মানুষদের মতো স্বভাব নয়, বরং লাঠিটা হাতে ঝুলবে, আর মাঝে মাঝে লাঠিটা তুলে দেখার স্বভাব, ক হাত আর বাকি আছে আকাশ ছুঁয়ে দিতে। মাঝে মাঝে মনে হবে ভারি বিড়ম্বনা জীবনে—কোথাকার হে লাট সাহেব তুমি অর্বাচীন! ঘোষাল এসে একদণ্ড দেরি করেনি, আর তুমি বসে আছ হাতে হুঁকা নিয়ে—তামাকের গন্ধ নেই! হ্যাঁ তো কে রে

তুই। অ মনার বেটা? কি মাছ। টেকচাঁদা খাওয়াতে পারিস? বিলে মাছ একদম হচ্ছে না শুনছি।

এইসব চিত্রকল্প গল্পের প্রথম দিককার জন্য ভেবেছিলাম। প্রথম থেকে গল্পটি আপনি নেবেন বলেছিলেন তবে সংক্ষিপ্ত আকারে। কিন্তু গল্প ছোট করতে হলেই লেখকের ভারি কষ্ট। যা যা যে যে ভাবে দরকার সব তখন ঠিকঠাক থাকে না। কিছু যেন কম পড়ে যায়। ঠিক চরিত্রটি ঠিকভাবে ফুটে ওঠে না। তবু প্রথম দিককার গল্পে এমন সব বর্ণনা, অথবা হিজলের ছবি থাকুক আমি চাইছিলাম। গল্পের মাঝামাঝি জায়গাটা সাদামাটা ভাবেই থাক। ঘটনা এখানে সবিশেষ, ঘটনা থেকে যে কোনো চিত্রকল্প আপনি গ্রহণ করতে পারেন। আমার তেমন লোভ নেই—এবারে ছবি আঁকার ভাব-ভাবনা সবই আপনার থাক। যেমন খুশি ভেবে নিতে পারেন।

তবে গল্পের শ্রীনাথবাবু আর দাঁড়ালেন না। ট্রেন এসে গেছে। এই-মাত্র ট্রেন ইন করছে প্ল্যাটফরমে। তিনি হন হন করে হেঁটে যাচ্ছিলেন। লাঠি ঘোরাচ্ছিলেন হাতের ওপর। যেন লাঠিটা স্ব-ভাবেই আছে। লাঠি নিজের মতো অহংকার নিয়ে বেঁচে আছে। ট্রেনের এ জানালা ও জানালায় কাকে যেন খুঁজছেন। মফস্বলের ট্রেন, পাশাপাশি স্টেশনের কে কোথায় কতটার ট্রেনে কোথায় যাবে তাঁর যেন সব জানা।

—'এই যে রামরতনবাবু, কলকাতা?'

—'আরে কি খবর। কাটোয়া যাচ্ছি। কেস আছে। কি রকম আছেন?'

—'ভাল। বেশ আছি।'

লাঠিটা মানুষটাকে অবলম্বন করে আছে। মানুষটা লাঠি অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে নেই।

—'আপনি কেমন আছেন?'

—'দিনগত পাপক্ষয় চলছে। এ-বয়সেও সংসার ছুটি দিচ্ছে না। আর পেরে উঠছি না।'

—'কত বয়েস হল ?' শ্রীনাথবাবু লাঠিটা বার দুই ঘোরালেন।

—'অনেক।'

—'কী যে বলেন। ভাল আছেন।' 'ভাল থাকুন।'

পাশ থেকে কেউ যেন হাঁকল, 'বড়বাবু হিঞ্জলের চাষ এবার কেমন।'

—'চাষ তো মনে হচ্ছে ভাল। তবে আশ্বিন না গেলে কিছু বলা যাবে না।' তিনি হাঁটতে থাকলেন। প্লাটফরমে হেঁটে যাবার সময় মনে হল, সামনের দরজা থেকে পর পর কটা কুকুর লাফিয়ে নামছে। কিছু বাকস পেটরা। কলকাতার পোষা বাবুর দল। ভদ্রলোক কুকুরগুলোর চেন ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। পাইপ খাচ্ছিলেন। অজ পাড়াগাঁ। মফস্বল জায়গায় মানুষ-টানুষ কি আর থাকবে। চোখে মুখে ভারি অবহেলা। শ্রীনাথবাবুর মানুষটাকে পছন্দ হল না।

মানুষ পছন্দ না হলেই শ্রীনাথবাবু ভারি গম্ভীর হয়ে যান। কোথাকার তুমি কে হে! একেবারে গাঁয়েগঞ্জে এসে ভেবে ফেলেছ মানুষ থাকে না এখানে! তিনি লোকটার দিকে এগিয়ে যেতে থাকলেন। এবং তিনি যে ভারি গণ্যমান্য মানুষ, এক ডাকে দশটা লোক এসে হাজির হয়, ছাখো, এই অঞ্চলে কিছু মানুষজন এখনও আছে, স্টেশনের পেছনে বড় দোতালা বাড়ি, পুকুর এবং ফুলের বাগান, সব এ শর্মার, কোথায় কোন অঞ্চলে দুর্লভ নীল জবা পাওয়া যায়, এখানে তুমি তাও পাবে—কি নেই বাগানে! তিনি যেতে যেতে দুবার গলা ঝেড়ে নিলেন, এই যে বাবু কোথায় যাওয়া হবে এমন বলার ইচ্ছে। স্পষ্ট গম্ভীর গলায় কথা বলার স্বভাব তাঁর।

তখন সিগনাল পেয়ে ট্রেন যাচ্ছে। ঝিক্ ঝিক্ ক্রমে অবিরাম ঝিক্ ঝিক্ শব্দ। আস্তে, এক দুই, এক দুই তারপর দুই তিন, দুই তিন চার, এবং ক্রমে বেশ স্পিড তোলার আগে মনে হল জানালায় কেউ গলা বাড়িয়ে ডাকছে তাকে। কচ্ছপের গলার মতো মুখ বার করা। বাতাসে শব্দটা লম্বা হয়ে যাচ্ছে। গার্ড সাহেব হাতে নিশানটা দুলিয়ে

ঝুলিয়ে কি বলছেন। শ্রীনাথবাবু ট্রেনের সঙ্গে ছুটলেন, বললেন, কি বললেন, কি বলছেন।'

—'রবীনবাবু মারা গেছেন।'

—'রবীনবাবু।'

—'আত্মহত্যা, বিশ খে···য়ে আ···ত্ম···হ···ত্যা।' শব্দগুলো ক্রমে লম্বা হতে হতে ট্রেনের সঙ্গে চলে যেতে থাকল। তিনি প্রায় লম্বা হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন, রবীনবাবু, ও লাইনের গার্ড, এবং এখানে আপে ডাউনে যতবার গেছেন, প্রায় হাত নেড়ে গেছেন। কখনও শ্রীনাথবাবু, বারন্দার ইজিচেয়ার, কখনও ফুলের বাগানে কখনও কনক রুজের দোকানের সামনে। সে লোকটা তা হলে মরে গেল! এবং পড়তে পড়তে তিনি প্রায় লাঠি দিয়ে কোনোরকমে সোজা রেখে নিজেকে কুকুরয়ালা বাঙ্গালী সাহেবটিকে বললেন, 'বাবুর কোথায় যাওয়া হবে?'

—'রায় সাহেবের বাড়ি।'

রায় সাহেব মৃগাঙ্কশেখর, মৃগাঙ্ক মানে ট্যাপা। ট্যাপার বাবার লাখখানেক টাকার একটা মহাল ছিল। মহাল বেচে ট্যাপা একবার ছোটলাটকে এ-গাঁয়ে নিয়ে এসেছিল। লাল কার্পেট পাতা হয়েছিল সড়কের ওপর দিয়ে এবং হাজার ছয়েক টাকা রাস্তা মেরামতের জন্য। জেলা বোর্ডের সভাপতি, ট্যাপা ছোটলাটকে এনে রায় সাহেব হয়ে গেছিল। তিনি এবার সহসা চিৎকার করে ডাকলেন, 'টুনে টুনে!'

কুকুরয়ালা সাহেবটি সামান্য ঘাবড়ে গেল। মুখের ওপর এ-ভাবে সহসা চীৎকার করে উঠতেই সে দু' পা পিছিয়ে গেল। কুকুরগুলি ছুটাছুটি লাগিয়ে দিয়েছে। টুনে ছুটে এসেছে কোথা থেকে। প্রায় মন্ত্রপুত মানুষের মতো টুনে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এসেছে এবং তখন বাবুটির মুখের ওপরই ফের তিনি চিৎকার করে বললেন, 'ভাখতো বাবুটি যাবেন কোথায়?'

টুনে বলল, 'হুজুর যাবেন কোথায়?'

হুজুর বুঝে পেল না, গাঁয়েগঞ্জে সে এসেছে নতুন। লোকজন তো

আসার কথা। কিন্তু স্টেশন ফাঁকা। একমাত্র এই বুড়ো মানুষটা তার সামনে। সে তো বলেছে, যাবে রায়-সাহেবের বাড়ি। এত বড় রায়সাহেব তার আত্মীয়, ওকে তো সমীহ করেই কথা বলা দরকার, অন্তত যে-ভাবে সে পাইপ ধরিয়েছে, আর পোশাকে-আশাকে তাই তো এ-সব গ্রাম্য মানুষের সঙ্গে কোনো মিল নেই—সে ভেবে পেল না কি বলবে। কুকুর-গুলো মারাত্মক রকমের ভয় পেয়ে এক দণ্ড আর স্টেশনে দাঁড়াতে চাইছে না।

বুড়ো মানুষটি টুনেকে ডেকে দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু টুনে এবং সাহেব মানুষটি আর একটা কথা বলছে না দেখে ফের বললেন, 'ট্যাপাদের বাড়ি যাবে। দিয়ে আয়।'

তারপর যেন এই একটু আত্মীয়-টাত্মীয়ের মতো কথাবার্তা বলে জানা, কে হয় ট্যাপা?

—'ট্যাপ্যা!'

—'হ্যাঁ ঐ রায়সাহেব মৃগাঙ্ক-শেখর।

এমন জাঁদ্রেল ভগ্নিপতিটির নাম ট্যাপা, সে জীবনেও শোনেনি। সে কিছুটা বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বলল, 'ভগ্নিপতি।' সে পাইপ টেনে যাচ্ছে।

শ্রীনাথবাবু বললেন, 'ওহে বাবু আগুন নেই। নিভে গেছে।'

নিভে গেছে! মানে আগুন। সে পাইপ টিপে বুঝল সত্যি আগুন নেই। সে তো খবর পাঠিয়েছিল, সে কিছুদিনের জন্য গিয়ে থাকবে। হিজলে এখন পাখি পড়ার সময়। হিজলে পাখি শিকারের জন্য সে আগে চলে এসেছে। নমু এবং আরতি আগামীকাল সকালের ট্রেনে আসবে। ওদের ফাংসান আছে আজ। ফাংসান শেষ না হলে আসতে পারছে না। সে আগে একা একা এসে বেশ রোমাঞ্চকর এক জায়গায় চলে এসেছে এমন ভাবতে পারবে—জীবনে তার এদিকটায় আসা হয়নি। বাইরে বাইরে জীবন—ইদানীং রিটায়ার করার পর মনে হয়েছে, হিজলে শিকারে গেলে মন্দ হয় না। ভগ্নিপতির কতদিনের

কতকালের অনুরোধ এবং ইচ্ছে, একবার সময় করে হিজলে বেড়িয়ে যাওয়া মানে বাংলাদেশটাকে বেশ মাটির কাছে থেকে দেখা, এমন সুযোগ হারানো ঠিক না। আসি আসি করেও আসা হয়নি। এখন এমন একটা বুড়ো মানুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে যে, এখানে এসে সত্যি কতটা ভাল করেছে বুঝতে পারছে না। সে বলল, কতদূর?'

—'ঐ তো, দূরে না। যান চলে যান।'

রায়সাহেবের শহরের বাড়িটাতে সে একবার এসেছিল। এটা গ্রামের বাড়ি। এখানে গাড়িটাড়ি থাকার কথা নয়। হেঁটেই যেতে হবে এটুকু বুঝতে পেরে খুব ঘাবড়ে গেল।

টুনে একটা বড় এ্যাটাচি কেস হাতে তুলে নিল। এবং বলল, ছুটো একটা কুকুর দিতে পারেন। কামড়াবে না তো!'

সাহেব মানুষটি সামান্য হাসল। বলল, ভয় নেই। কামড়ায় না।'

বুড়ো মানুষটি চলে যাচ্ছিলেন, কামড়ায় না শুনে বললেন, 'মিথ্যে কথা। কামড়ায়।'

সাহেব মানুষটি অগত্যা চুপ করে গেল। বুঝতে পারল না, কামড়ায় না বলাতে এত চটার কি আছে। সত্যিতো ভারি নিরীহ এরা। কুকুরগুলোর মা বাবা বংশ রক্ষা করে গেছে। সে এখন গুনে বলতে পারে মাত্র পাঁচটা। গোটা তিনেক মরে গেছে। এদের বয়েস বেশি না। সাত আট মাসও হয়নি। বাড়িতে কেউ থাকবে না, চাকর বাকরের ওপর বিশ্বাস কম। খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো হবে কিনা, এবং এখানে এসে যে নিশ্চিন্তে দুদিন থাকবে তার উপায় থাকবে না। বেড়াতে এসে মন উচাটন থাকলে সুখ নেই বেড়িয়ে। একেবারে সঙ্গে নিয়ে আসা সেজন্য।

সে বুড়ো মানুষটাকে খুশি করার জন্যই বলল, 'হ্যাঁ কামড়ায়। সামান্য ভয় থাকা ভাল।' কিন্তু বুড়ো মানুষটার এই উপকারটুকু— কোথাকার সে কে, এখন নিজেকে এমন বিস্তৃত হিজলের প্রান্তে দাঁড়িয়ে কোথাকার কে সে এমনই মনে হল। টুনে আগে আগে হেঁটে যাচ্ছে।

দু তিনটে গরুর গাড়ি লাল সুরকির পথ ধরে গাঁয়ের পথে নেমে যাচ্ছে। সে আর তাকাল না। বুড়ো মানুষটি ট্রেন চলে গেলে খালি প্ল্যাটফরমে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। আর লাল ইটের ছোট ছোট কোয়াটার, একটা খাল, ছোট সাঁকো। বর্ষার সময়। বর্ষাকালে এখানে মাঝে মাঝে এমন ভয়াবহ বন্য' হয়, যে মানুষের আবাস ঠিক থাকে না। সে এবং টুনে হাঁটছে। কুকুরগুলি বেশ এবার নিরীহ গোছের—কর্তার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছে। একটুও কুঁই কাঁই করছে না।

২

আপনি ইচ্ছে করলে চিত্রকল্প ব্যবহার করতেও পারেন নাও পারেন, তবে চিত্রকল্পের সুবিধা সাময়িক ভাবে পাঠককে কিঞ্চিৎ উত্তেজিত করে। চরিত্ররা সজীব হয়ে ওঠে। গল্প প্রাণবন্ত হয়। কিছুটা চলচ্চিত্রের সামিল। আসলে যেখানে গল্প গভীরে মগ্ন চিত্রকল্প সেখানে বাহুল্য মাত্র। বুড়ো মানুষটার বয়েস হয়েছে। বুড়ো মানুষটা মানে শ্রীনাথবাবু। সারাটা রাত তিনি ঘুমোতে পারেননি। বুড়ো বয়সে এমনিতেই ঘুম কম হবার কথা, কিন্তু কাল রাতে রবীনবাবুর আত্মহত্যা কথাটা সারারাত খুব জ্বালিয়েছে। মানুষ আত্মহত্যা করলে তাঁর ভারি কষ্ট হয়। আর পরিচিত লোক হলে তো কথাই নেই। এবং সেই কুকুরয়ালা সাহেব, পাইপ টানা মানুষ স্টেশনে দাঁড়িয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করার মতো, তা ছাড়া বড়বাবু এসেছেন নতুন, বিকেলে, এবং সন্ধ্যায় ভেবেছিলেন, অন্তত এসেই দেখা করে যাবেন, এই রেল কোয়ার্টারগুলোর পাশে তার এত বড় বাড়ি এবং প্রতিপত্তি, সব মানুষেরা খবর দিয়ে যায় যেন আছেন এলাহি এক মানুষ, যেমন তেমন মানুষ নয় তিনি? বাড়ি, বাগান পুকুর এবং বড় রকমের চাষবাস নিয়ে আছেন, যদিও ছেলে ধীরেন্দ্র দেখা-শোনার দায়িত্ব

কিছুটা নিয়েছে, এবং সংসারে বৌমা এসেছেন, তাও পনেরো বিশ সাল। এবং দুজন নাতিন, ওরা বয়সী হয়ে যাচ্ছে। ফুল ফোটার মতো ফুটছে। বাগানে দাঁড়ালে বোঝা যায় তিনি তাঁর পুত্র এবং ফ্রক পরা দুই নাতিন মানে রুনু ঝুনু'দের নিয়ে বেশ আছেন। ওরা অবশ্য থাকে শান্তিনিকেতনে। দুজনই কিসব পোশাক পরতে যে ভালবাসে! এবং কখনও কখনও বাগানে মালি আর ছেলে দুই নাতিন এবং তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থাকলে বোঝা যায় বেশ অহংকার চোখে মুখে। নাতিনেরা বেশ চঞ্চলা রমণীর মতো চকিত হরিণী হয়ে যাচ্ছে।

সকালে যদি চিত্রকল্প আঁকা যায় তবে কার সাধ্য, এমন একটা চোখ মুখ সজীব হয়ে উঠবে চিত্রকল্পে—যাতে থাকবে বুড়ো মানুষটা এবং বয়েস হবার জন্য নিদারুণ সব দুঃখ।

সকালে রোদ বেশ উঠেছে। স্টেশনের বাইরে অশ্বত্থ গাছ। কনক রুজের মিষ্টির দোকান এবং চায়ের দোকানে দু একজন যাত্রি বসে গেছে। এবং ফুলরি অথবা জিলিপি খাচ্ছে। দুটো গরুর গাড়ি, গরুগুলো ছাড়া, ঘাস খাচ্ছে। রুনুঝুনুর ঘুম ভাঙেনি। ওর মা দুবার ডেকে গেছে। ওরা পাজামা পাঞ্জাবী পরে শোয়। ছোটটারও যা বয়েস দুটো কাচ্চা বাচ্চার মা হলে মানাত। কিন্তু এমন স্বভাব ওরা কখনও মা হবে বিশ্বাস হয় না। চা খাবে, শুধু চা, চা খেয়ে বাথরুম। তিনি বাধ্য হয়ে নতুন হাল ফ্যাসনের দোতালায় বাথরুম করে দিয়েছেন। সাওয়ার আছে। সাদা টাইলের মেঝে, দেয়াল। এবং সোপের ফেনা দিয়ে রুনু ঝুনু স্নান করে। না হলে এত সময় লাগে না। মাঝে মাঝে ওঁর যখন খুব দরকার বাথরুমের তখন তিনি দেখতেন কেউ না কেউ ঠিক বাথরুমে ঢুকে বসে আছে। এতে রাগ বাড়ছিল। তিনি দোতলায় সেজন্য দুই নাতিনের জন্য প্রায় আলাদা ঝকঝকে বাথরুম করে দিয়েছেন। এবার মেয়ে দুটো যত বড় হচ্ছে, বাড়ির চেহারা তত পাল্টে যাচ্ছে। যেমন. আগে বাগানে তিনি নানারকম জবার গাছ, এবং পৃথিবীর যাবতীয় জবা, এমনকি পঞ্চমুখী জবার গাছ

এনে লাগিয়েছিলেন—বিশেষ করে ধীরেনের মা তো পঞ্চমুখী জবা না হলে পুজো আর্চায় সরগোল ফেলে দিত—এখন বাগানে কোনো জবা গাছ নেই। কেবল গোলাপ, রজনীগন্ধা। টগর গাছ আছে। বোগেন ভেলিয়া উঠছে। কেবল বড় হয়ে উঠছে—এবং মাঘে ফাল্গুনে মৌসুমী ফুলের চাষ। তাই বড় বড় সব ডালিয়া, ক্রিসেন্থিমাম, কত সব যে ফুল! এবং এই রুনু ঝুনু জানেও সব। কখন কি ফুল কিভাবে ফুটতে ভালবাসে রুনু ঝুনুর চেয়ে পৃথিবীতে আর কেউ বোধ হয় এত ভাল জানে না।

রুনু ঝুনু এখন দুরন্ত সন্ন্যাসিনীর মতো নিচে ছুটছে। ওদের বব করা চুল। ললিতা ভারি ফ্যাসনদুরস্ত মহিলা। মায়ের ইচ্ছেতে ধীরেন মেয়েদের শান্তিনিকেতনে রেখেছে। হিজলের ঘেরে ধান বছরে বিশ বাইশ হাজার টাকার হয়ে যায়। ধীরেন এখন অঞ্চলের সমাজ-পতি। তিন-চার বছর হল, কোথাকার কোন বোর্ডের মেম্বর হয়ে সাত তাড়াতাড়ি বিদ্যুতের ব্যবস্থা পর্যন্ত গাঁয়ে করে ফেলেছে।

তিনি নিচের বারান্দায়। ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। গড়গড়ায় তামাক টানছেন। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া হিজল থেকে উঠে আসছে। বাগানে সব নানাবর্ণের প্রজাপতি, এবং রুনু ঝুনু পরেছে রঙ বেরঙের ঝুল দেওয়া পাতলা ফুলহাতা টপ, আর ফুল ফল আঁকা জিনস্। ওরা এই সকালে বাগানে একটা হলুদ ফড়িং ধরার চেষ্টা করছে। আসলে ফড়িং না প্রজাপতি তিনি এখান থেকে ঠিক বুঝতে পারছেন না।

তখনই মনে হল, রেল কোয়ার্টারের আল দিয়ে কারা আসছে।

ডাকলেন, 'টুনে।'

কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

—'রুনু।'

—'যাই দাদু।'

—'দেখতো কারা আসছে।

—'চিনি না.'

ভাল করে না দেখেই বলল, চিনি না। আর যারা আসছে এভাবে তাদের সামনে চিনি না বলতে নেই। এরা যে কি শিখছে! সহবৎ একদম জানে না। লজ্জা-টজ্জা এদের নেই। একদম নেই। সেই কবে বড় কর্তা, অর্থাৎ তিনি, বড় বৌর মুখ, তখন তো বড় বৌ প্রায় নাবালিকা বলাই চলে অথচ কি ধার ছিল চোখে, আর কি আশ্চর্য ছিল ধীর স্থির মুখটি। ফুটে ওঠার আগে যেন শরীরে ঝড়ের সংকেত পেয়ে স্তব্ধ। আর এরা কি! লাজ লজ্জা, বিনয়, ভব্যতা, সব গেছে!

তিনি নিজেই উঠে দাঁড়ালেন। পাশ থেকে লাঠিটা নিয়ে লনে নেমে এলেন। এবং চোখে কিছুটা কম দেখলেও টের পেলেন—ট্যাপা আসছে। সঙ্গে সেই সাহেব সুবা লোকটি।

ট্যাপা এসেই গড় হল।—'বড়দা, আর আমার বড় শালক।'

—'কুকুরগুলো কোথায়?'

সাহেব মানুষটি হাসলেন। বললেন, 'আমার নাম অধীর চক্রবর্তী।'

—'অত সহজ নাম আর পোশাকে এত ভারিক্কি কেন?'

—'রাখতে হয়।'

—'বাঁচার জন্য রাখতে হয়। আসুন। বড় কর্তা শ্রীনাথবাবু সত্যিকারের কিছু বুঝে টুঝে যেন বলে ফেললেন, 'আসুন।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'দাদা আপনি কি! ওঁকে আর আপনি টাপনি বলবেন না। অধীর বলবেন।'

শ্রীনাথবাবু খুশি হলেন। গতকাল তুমি ধরাকে সরা জ্ঞানে ভুল করেছ। এখন বুঝতে পারছ, পাড়াগাঁয়ে লোকজন থাকে। পাড়াগাঁয়ে লোকজন না থাকলে তোমরা বাঁচ কি করে!

মৃগাঙ্ক বলল, 'দাদা এখন বসব না। নমু আরতি আসবে। গাড়ি আসতে বেশি দেরি নেই। অধীরবাবুর মেয়ে।'

—'গাড়ি পাঠালি না কেন?

—'আজ আসবে ধারণা ছিল। পনের ষোল উনি একই ভাবে লেখেন।'

আজ ষোল তারিখ। শ্রীনাথবাবু বললেন, সে হয়। এস। ট্রেক লেট আছে।'

—'খবর নিলেন।'

—'খবর না নিলেও টের পাই।'

মৃগাঙ্ক এই মানুষটিকে জানে, অনেকদিন থেকে, প্রায় বলা যায় শৈশব থেকে এবং যত বয়স বাড়ছে তত এই মানুষ কেমন নিজের ওপর বেশি আত্ম-নির্ভর, না এটা আত্ম-অহংকার ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। হাতের লাঠি ফেলা দেখলে সেটা টের পাওয়া যায় বেশি। লাঠি সহজে মাটিতে ফেলে হাঁটতে চান না।

মৃগাঙ্ক ইশারা করল অধীর চক্রবর্তীকে। বসে যাওয়াই ভাল! মানুষটা বসে না গেলে রাগ করবেন।

শ্রীনাথবাবু বললেন, 'বাগানটা কেমন দেখছেন?'

—'আবার আপনি!'

—'ও কথা বলতে বলতে ঠিক হয়ে যাবে।'

রুনু ঝুনু এখন একেবারে চুপ মেরে গেছে। ওরা টগর গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে। এবং বেশ বোঝা যায় লজ্জা টজ্জা কিছু তখনও অবশিষ্ট আছে। না হলে এখনও ছুটে বেড়াত। আসলে শ্রীনাথবাবু বুঝতে পারলেন অধীরের চেহারাতে আভিজাত্য আছে। মেয়েরা বোধ হয় আভিজাত্যের ছাপ দেখলে লজ্জা পায়। ওরা যা হোক তবু লজ্জা পেয়েছে।

শ্রীনাথবাবু বললেন, 'তোমরা কি ভেতরে যাবে।'

রুনু ঝুনু আর একটি কথাও বলল না। এক দৌড়ে ও-পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

অধীরবাবু বললেন, 'আপনার নাতিন?'

—'হুঁ। বসুন।'

—'ভারি মিষ্টি স্বভাবের!'

—'তা হয়েছে। ক'দিন থাকা হবে?'

—'যে ক'দিন ভাল লাগে।'

—'খারাপ লাগে এখানে বলে কেউ তো বলে না।'

—'বেশিদিন ভাল নাও লাগতে পারে।'

শ্রীনাথবাবু হাঁকলেন, 'কে আছ! এদিকে তিন কাপ চা পাঠিয়ে দেবে।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'ট্রেন কত লেট?'

মৃগাঙ্কের চাকর রাস্তায় দাঁড়িয়ে। গরুর গাড়ি বেশ ফ্যাসন দুরস্ত। ছই আছে। এবং কারুকাজ করা ছই। নিচে খড়ের ওপর তোষক, সাদা চাদর। এমন কি লম্বা একটা তাকিয়া। শালা ভগ্নিপোতে বেশ হেলে দুলে এসেছে। চাকরটা বোধ হয় বুঝতে পারছে ট্রেন আসছে। মৃগাঙ্ক বলল, দাদা, কত লেট বললেন না তো!'

—'তা, দাঁড়াও হিসেব করে বলতে হবে!'

অধীরবাবু তাকালেন। দেয়ালে সব বড় বড় ছবি। এবং একটা ছবিতে শুকনো মালা। ঠিক সোফা কোচ যেমন আছে, তেমনি তক্ত-পোষ এবং সাদা ধবধবে গদি। যার যেখানে যেমন খুশি শুতে পারে বসতে পারে। দেয়ালের চুনকাম মাঝেসাঝেই হয়। নীল রঙটা বোধ হয় বড় কর্তার খুব পছন্দ। বাড়ির দরজা জানালার রঙ নীল। কড়ি বরগার রঙ নীল। এবং পুরোনো চেয়ার টেবিলের বার্নিশ উঠে যাওয়ায় নীল রঙ করে নিয়েছেন।

ব্যাপারটাতো ভারি গোলমেলে। ঠিক জানেন না। অথচ লেট বলছেন। ট্রেন এসে গেলে, ওরা না দেখতে পেলে হয়তো ট্রেন থেকে নামবেই না। সে বলল, 'বরং আজ উঠি।'

—'খুব দূর না?'

অধীরবাবু বুঝতে পারল না।

—'ট্রেন লেট কত বলুন?'

—'প্রায় পঁয়তাল্লিশের মতো।'

—'পঁয়তাল্লিশ মিনিট!'

—'হ্যাঁ। কটা বাজে মৃগাঙ্ক!'

—কটা বাজে তাও জানেন না। অথচ লেট বলে বসিয়ে রেখেছেন।

—'আটটা দশ।'

—'আটটা পনেরোয় আসে।'

—'তা হলে বলছেন নটা বাজবে?'

—'হ্যাঁ। এখন তো ট্রেন বাজার-সাহুতেই আসেনি। বাজারসাহু ঢুকলেই টের পাব। গুম গুম শব্দটা আরও ভারি শোনাবে। স্পষ্ট বাজবে।'

—'আপনি সব টের পান।'

—'বিশ-ত্রিশ মাইলের ভেতর ট্রেন থাকলে ঠিক টের পাই।'

অধীরবাবু দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। গাঁয়ে থাকলে এমন স্বভাব হয়। কত জানেন! যেন সবই নখদর্পণে। শ্রীনাথ-বাবুকে বাদ দিয়ে আগে কেউ কিছু টের পাবে হতেই পারে না যেন।

আসল কথাটা এখনও ভগ্নিপতি ভাঙছে না। অবশ্য কথা ছিল, ফেরার সময় নমু আর আরতিকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এখানে আসবে এবং হিজলে তিতির শিকারের কথাটা বলে নেওয়া ভাল, না হলে কখন ধরে ফেলবে—শ্রীনাথবাবুদের ঘেরিতে এবার তিতির পড়ছে ভাল। একটা দিক চাষাবাদ হয়নি, অথবা ইচ্ছে করেই তিনি আউশ ধান লাগিয়েছিলেন। ধান পেকে গেছে বলে কাটা হয়ে গেছে। এখন জলে নানা রকম শামুক, গুগলি, এবং ছোট ছোট মাছ। আর ধানের গুঁড়িতে বসে থাকাও নিরাপদ। অন্যান্য ঘেরিতে শুধু আমনের চাষ, সুতরাং ওখানে তিতির পাওয়া যাবে না। সহসা শালক আসবে, চিঠি দিয়ে এ ভাবে আরও দুবার আসেনি, এবারও আসবে মৃগাঙ্ক বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারলে নিজের ঘেরিতে আউশের আবাদ করত। তিতিরের মাংসের প্রলোভনে তবে যথার্থই অধীর চক্রবর্তী এসে গেল।

মৃগাঙ্ক বলল, 'দাদা, অধীরবাবু তিতির শিকারে যাবে।'

—'তা যাবে না তো কি করবে।'

—'কিন্তু আমাদের ঘেরিতে, হাজিদের ঘেরিতে খোঁজ নিয়েছি। তিতির বসছে না।'

—'কেন কেন ?'

—'ধান গাছ সব বড় হয়ে গেছে। বসলেও দেখা যাচ্ছে না।'

—'ঢিল ছুঁড়ে দাও। তারপর উড়ন্ত ঝাঁকে গুলি। তবে তো শিকার। পারো ?'

অধীর চক্রবর্তী বেশ লম্বা মতো কুর্তা পরেছে। সকালের পোশাক বোঝাই যায়। যেমন ঝুনু ঝুনু বিছানায় ভারি ঢিলেঢালা পোশাক পরে শোয়। এবং বৌমার আমলে ঠিক অতটা রিভোল্যুশন হয়নি। সকালে ঘর খুলে বের হলে বোঝাই যায় না ঝুনু ঝুনু পুরুষ না মেয়ে।

অধীর চক্রবর্তী বলল, 'না।'

—'অভ্যাস নেই।'

—'অভ্যাস থাকে না। করতে হয়। করলেই অভ্যাস হয়ে যায়। আর গতবার, এদিকে প্লাবন-টাবন হল, মৃগাঙ্ক, মনে আছে বোধ হয়, হিজলের জলে ভেসে গেল সামনের রেলপুল।'

যেন শ্রীনাথবাবুর বলার ইচ্ছে—কত বড় প্লাবন, সে না দেখলে বোঝা যাবে না। রেলপুল উড়িয়ে নিয়েছে কখনও হয়নি। প্লাবনে পুল উড়িয়েছে। এমন কি নেহরুজী পর্যন্ত এসে হেলিকপ্টারে দেখে গেছেন, সেবারের প্লাবন সত্যি একটা প্লাবন। তেমন প্লাবনে হিজলে সেই দামাল বন্যার ভেতর তিনি একা। বুঝতেও পারেন নি, হুড়মুড় করে চলে আসছে সে। ঝড় বৃষ্টি তো হয়ে থাকে, দু চারদিন চলবে, এবং ক্ষ্যাপার মতো কি করে যে সে নেমে আসে, অথচ একা তিনি সাঁতরে পার হয়ে এসেছিলেন বন্যার জল। এত কথা তিনি অবশ্য বলবেন না। সেই সেবারে, বন্যায় পুল উড়িয়ে নিল, তোমার তো মনে আছে মৃগাঙ্ক। বাকিটা বলবে মৃগাঙ্ক—সেই আশায় তিনি 'আরে

গতবার, এদিকে প্লাবন-টাবন' এমন বলে অভ্যাস-টব্যেসের কথা বেমালুম উড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

অধীর চক্রবর্তী—হাঁ। ঠিক চা বলা যাবে না, প্রায় মগের মতো বড়ো চিনেমাটির বাসনে খাঁটি দুধের চা। চা এর চেয়ে খাঁটি দুধের পরিমাণ বেশি, এবং নানা রকমের ভাজা, যেমন, চিড়ে ভাজা, যেমন খিরের সন্দেশ, সন্দেশ না বলে গোল্লা বলা ভাল। দুটো ডিম হাফ-বয়েল করা।

শ্রীনাথবাবু বললেন, 'খাও হে খাও।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'এত সব কেন আবার!'

শ্রীনাথবাবুকে সামান্য রুষ্ট দেখাল। 'কবে তুমি মৃগাঙ্ক এখানে এসে এমন না খেয়েছ। সব তো ঘরের।' অধীর চক্রবর্তীর দিকে সামান্য তাকিয়ে বলা, 'খাঁটি জিনিস। খাও কিছু হবে না।'

কেমন ইতস্তত করতে দেখে তিনি ফের বললেন, 'ট্রেন বাজারসাহু থেকে ছেড়েছে। এখনও প্রায় পঁচিশ মিনিট। তোমার খেতে বিশ মিনিট। আচ্ছা দাঁড়াও, কে আছিস? হরিপদ, গোলাম!'

গোলাম এলে বললেন, 'ষ্টেশনে যা। কলকাতা থেকে সব দিদি-মনিরা আসবে। লটবহর নামিয়ে রাখগে।'

অধীর চক্রবর্তী না-খাওয়া আর নিরাপদ ভাবল না। না খেলে উঠতেও দেবে না। তিতির শিকার আছে আবার। সবটাই সে খুব খুশি হয়ে যেন খেল। চেটেপুটে খেল। যতটা খেল, তার চেয়ে বেশি সুখ্যাতি করল খাবারের। শ্রীনাথবাবু তখন তাড়াতাড়ি লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবী এবং লম্বা সাদা লুঙ্গির মতো পোশাক পরে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'ট্রেন সিগনালের কাছে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এস।'

আসলে শ্রীনাথবাবুর বাড়িটা স্টেশনের খুব কাছে। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট থেকে যে কেউ এদিকটায় এলে, এখানে উঠে যায়। কারণ এখানে আছে সেই বুড়ো মানুষটা। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অন্য কোথাও উঠলে অভিমান করে থাকেন তিনি। শুধু জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কেন,

সরকারী আমলা কর্মচারী যে কেউ, এমন কি নিদেনপক্ষে একজন জেল দারোগার যে যত্নআত্তি করেছিলেন তাতে করে মানুষটাকে এক ধরনের পাগলই বলা যায়।

মৃগাঙ্ক সবই বোঝে। ওর বয়স ছয়ের কোঠায়, শ্রীনাথবাবুর বয়েস সাতের কোঠায়। শক্ত সমর্থ এখনও অনেক বেশি। মৃগাঙ্ক লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটে। এ-বয়সে এটা ভাল না শ্রীনাথবাবু বুঝিয়েছেন। ট্রেন এসে গেছে বলে রক্ষা। তা না হলে চারপাশে আর কি আছে—তাঁর বড় পুকুরের মাছ, এখন কতটা ওজনের হয়েছে, কটা মাছ গত প্লাবনে ভেসে গেল সব নখদর্পণে তাঁর। এবং গাছপালার ভেতর মানুষটা হেঁটে যাবার সময় বুঝি টের পান জীবনে শীতের হাওয়া কবেই আরম্ভ হয়েছে. যথাসম্ভব তাকে এখন শুধু ঠেলেঠুলে দূরে সরিয়ে রাখা।

শ্রীনাথবাবু বললেন, 'নতুন বড়বাবু এয়েছে।'

. —'কবে এল ?'

—'দু দিন হল এয়েছে।'

—কেমন মানুষ ?'

কেমন মানুষ তিনি কি করে বুঝবেন! এখনও তো লোকটা এল না। না এলে তিনি কি করে বুঝবেন কেমন মানুষ। আর তিনি অযথা বলতেও পারেন না, এসেছে, অথচ তাঁর সঙ্গে দেখা করেননি, বললে, এরাও আসকারা পেয়ে যাবে—এখন তোমার দিন নেই হে বড় কর্তা, যেমন আমার দিন গেছে, তোমারও দিন যেতে বসেছে। তিনি শুধু বললেন, বেশ ভাল। খুব হৈ চৈ প্রিয় মানুষ। এবং কথায়বার্তায় শ্রীনাথবাবু এত সব খবর দিয়ে দিলেন স্টেশনের নতুন বড়বাবু সম্পর্কে যে মনেই হবে না লোকটার সঙ্গে তাঁর কখনও পরিচয় হয়নি।

আর তখনই ট্রেনটা লাফিয়ে প্ল্যাটফরমে ঢুকে গেল।

অনন্ত আকাশের নিচে হিজলের বিল, ধারে ধারে রেললাইন কত দূরে চলে গেছে। প্রায় দিগন্তে বেঁকে গেছে সরু রেখার মতো। আর এই স্টেশনে দাঁড়ালে এভাবে দেখা যায় লাইন প্রায় বৃত্তাকারে ঘিরে ফেলেছে হিজলের বিলকে। কি প্রকাণ্ড, আর অসীমবিস্তৃতি এই বিলের। শুধু জল, জলের পাশে এখনও মাঝে মাঝে ডাঙ্গা, আর ঘেরির উঁচু সব পাড়। পাড় ধরে ধরে এক ঘেরি থেকে সহজেই আর একটা ঘেরিতে চলে যাওয়া যায়। ডুবন্ত এক স্থলভাগের ভেতরে দ্বীপের মতো সব বাঁধ, চারপাশে বাঁধ দিয়ে বন্যার জল আটকে রাখা হয়েছে, কোনোটা মাইলের ওপর হবে লম্বায়। চারপাশে বাঁধ, বাঁধের ভেতরে এখন সব সবুজ ধানের গাছ। বাইরে জল, অনন্ত জলরাশি এবং যে কোনো সময়ে প্লাবন এলে, ঘেরির বাঁধ সব ভেঙ্গে জল ঢুকে যায় এবং ফসল নষ্ট হয়ে গেলে করাঘাত কপালে। তবু মানুষ সেই কবে থেকে এমন একটা ভয়াবহ জলে ডাঙ্গায় চাষ আবাদ করে প্রকৃতির খেয়াল খুশিকে আঙ্গুল দেখাচ্ছে।

শ্রীনাথবাবুর মনে হয় বুড়ো আঙ্গুল দেখানো ছাড়া আর কি। শ্রাবণ আষাঢ়ে নিদারুণ বর্ষায় যখন জলে ডুবে যায়, এবং চারপাশের নদী যেমন দ্বারকা, ব্রাহ্মণী ফুলে ফেঁপে যায়, তখন সব জলের চাপ এই বিল একা বহন করতে থাকে। পারে না যখন সব ঘেরির বাঁধ ভেঙ্গে একেবারে একাকার করে দেয় বিলটাকে। মানুষের তখন কাজ বেড়ে যায়। ঘেরি মেরামতের কাজ। আর যেবারে থেকে যায় চাষ আবাদ, মা বসুন্ধরা উজার করে দেন ফসল। বছরের ফসলে চোখ বুজে তিন চার সাল চলে যায়। এবং প্রায় ফাটকা খেলার মতো। মহাজনেরা এসে জমির দর বাড়িয়ে দিয়েছে। নতুন নতুন সব ঘেরি তৈরি হচ্ছে বিলে। জমির দাম দুর্মূল্য হয়ে গেছে। শ্রীনাথবাবু সেই

বয়সে যখন তার যৌবনকাল, নবাবদের কাছ থেকে তিন হাজার বিঘে জমির ইজারা নেন সামান্য দামে। তিনিই প্রথম টের পেয়েছিলেন, বর্ষায় চারপাশে বাঁধ দিয়ে ঘেরিতে ফসল ফলাতে পারলে সোনার ফসল। দূর দূর গাঁয়ে সেদিন খবরটা রটে গিয়েছিল হিজলের বিলে ঘেরি তৈরি করছে বড়কর্তা। পাগল। বানের জল যখন নেমে আসে চারপাশের সব গঞ্জও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ময়ূরাক্ষী তখন ক্ষেপা বাঘের মতো। যেখানে সামান্যতম বাধা আসে ধুয়ে মুছে নিয়ে যায়। আর এতো সামান্য মাটির বাঁধ। রক্ষা করে কার সাধ্য। তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নি। সব সঞ্চিত অর্থ লগ্নি করার মতো ঘেরিতে উজার করে দিয়েছিলেন সব।

অধীর চক্রবর্তী তখন পাশের একটা কামরায় কার সঙ্গে কথা বলছেন। ট্রেন থেকে সব যাত্রীরা নামছে। দু'জন খুব সুন্দর মতো যুবতী দাঁড়িয়ে আছে পাশে। তারাই আরতি আর নমু এবং আরো তিনটে ছেলে যুবক মতো, লম্বা চুল, গোঁফ লম্বা করে ছাঁটা। বড় বড় লেদার এটাচি, এবং বেডিং দেখে শুনে কেউ বুঝি নামিয়ে দিচ্ছে। ওরা এমন একটা গ্রাম্য জায়গায় আসতে পেরে ভীষণ খুশি। মাতৃ-ভাষায় প্রায় কেউ কথা বলছে না। গ্র্যাণ্ড, ডিসেন্ট, বিউটিফুল, এমন সব শব্দ খৈ ফোটার মতো মুখে ফুটছে। এখনও ভাল করে হিজলের বিল সামনে—চোখে পড়েনি। ট্রেন চলে গেলে দেখতে পাবে, পাহাড়ের মতো উঁচু টিলার নিচে অনন্ত আকাশ, যত দূর চোখ যায় কেবল বিলের জল। এখন বর্ষাকাল বলে, দেখা যাবে সব বুনো হাঁসেরা উড়ে যাচ্ছে আকাশে। এবং এই প্ল্যাটফরম, ছোট্ট লাল ইঁটের বাড়ি, সব নিমেষে মনে হবে যাদুকরের দেশের মতো। আর পাশেই সেই কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর বড় বাড়িটা। নতুন রঙ হয়েছে বলে রূপকথার মতো মনে হয় বাড়ির দরজা-জানালা। এমন নিরিবিলি নিঃসঙ্গ মাঠের ভেতর একাকী একটা প্রাসাদের মতো বাড়ি দেখে ওরা বলবে ছাখো, ছাখো, কি সুন্দর লাগছে বাড়িটা।

হয়তো বায়নাক্কা বেড়ে যাবে—বাবা, আমাদের এমন একটা সুন্দর বাড়ি হয় না। এমন উদার আকাশ পৃথিবীতে আর কোথায় আছে বাবা।

অধীর চক্রবর্তী, মৃগাঙ্ক প্ল্যাটফরমেই পরিচয় করিয়ে দিল। ওরা উবু হয়ে প্রণাম করছে। ছেলে তিনজন কাছে আসছে না। আরতি লম্বা শ্যামলা বরণের মেয়ে। চুল ববকাটা। ফ্যাসন দুরস্ত চেহারা। নমু জাপানী পুতুলের মতো দেখতে। উজ্জ্বল। এবং জানা গেল, আজ বিকেলেই তিতির শিকারে যাওয়া যাবে। বড়কর্তা যদি সঙ্গে থাকেন। নৌকায় জলে জলে ভেসে যাওয়া। তারপর ঘেরির ডাঙ্গাতে নামিয়ে দিলে, কি যে মজা হবে। এবং অধীর চক্রবর্তীর ভারি ইচ্ছে রুনু ঝুনু, সঙ্গে থাক, তখন তিনি আর না করেন কি করে। সব কিছুরই মূলে তাঁর বৈভব। কিন্তু মনটা ভীষণ খচ খচ করছে। স্টেশনের নতুন বড়বাবু জানালেনই না, এই স্টেশন বলতে হিজলের বিলে একচ্ছত্র অধিকার বলতে, তিনি। আগের বড়বাবু থাকলে ছুটে আসত প্ল্যাটফরমে। আসুন বড়কর্তা, গরম জিলিপী এসেছে, খাওয়া যাক। আর দশটা-পাঁচটা লোক তার সামনে সম্ভ্রমে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। স্টেশনের নতুন বড়বাবু যদি তেমনভাবে কথা না বলল ইজ্জত কোথায়! এ-স্টেশনে এসে তো এটাই নিয়ম প্রথম এত বড় একটা মানুষের সঙ্গে দেখা করা। তুমি নতুন বড়বাবু এত অহংকার কোথায় পাও হে! এবং আবার ফের চিৎকার 'বিল্টু!'

একটা লোক কোত্থেকে মুহূর্তে মাটি ফুঁড়ে প্রায় যেন উঠে, আজ্ঞে কর্তা।'

—'এগুলো সব তুলে দে।'

বাক্স পেটেরা সব দু-চারজন মিলে যেন মন্ত্রপূত মানুষ এরা তাঁর, ডাকলেই যো হুকুম. নিমেষে সব কাঁধে মাথায় তুলে নিতে গেলে অধীর চক্রবর্তী বলল, 'আরে কি করছেন বড়কর্তা!' পুরোপুরি বাঙ্গালী ভাষা, 'লোকতো আছে, আবার ওরা কেন!'

বড়কর্তা কোনো কথা বললেন না। বিকেলে যে কি হবে? দাবা খেলার জন্য কাকে বলা যায়। নতুন বড়বাবুকে খেলাটা শেখাতে সময় লেগে যাবে, কার সঙ্গে আর সমানে সমানে বসে তিনি খেলবেন। এবং অধীর চক্রবর্তী দাবা খেলা জানে কিনা, একবার জিজ্ঞেস করলে হয়, মনে হতেই বললেন, 'বিকেলে কি করছ অধীর! মৃগাঙ্ক তো ব্যস্ত মানুষ, সময় হবে না। অধীরকে পাঠিয়ে দিও।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'দাদা বিকেলে তিতির শিকারে যাবার কথা হল যে!'

ওরা তবে আজই তিতির শিকারে বের হতে চায়। কিন্তু বিকেলে যদি স্টেশনের ছোটবাবু বড়বাবুকে নিয়ে গিয়ে হাজির হয়, তিনি বাড়ি না থাকলে ফিরে যেতে হতে পারে—এসব ভাবার সময় দেখা গেল ছেলেগুলো মেয়ে দুটোকে প্রায় ঘিরে যেন পারলে স্টেশনেই খেয়ে ফেলে—অধীর কি দেখতে পায় না, এরা কারা, কেউ হবে ঠিক। 'কারা অধীর?'

—'ওদের সঙ্গে পড়ে '

পড়ে যখন তখন তো বেশ আরামে থাকবে। সবুজ মাঠে, বেশ নরম সবুজ ঘাস গজিয়েছে। তা ভাল। তিনি আর দাঁড়ালেন না। বড়বাবুর মুখোমুখি পড়ে গেলে হয়তো চেনা জানার কাজটা এখানেই হয়ে যাবে। তবে আর মান্যি লোকের মান থাকে না। স্টেশনে এ সময়ে তাঁর আসাই ঠিক হয়নি। দেখা হয়ে গেলে তিনি দুদণ্ড না-দাঁড়িয়ে পারবেন না। এতকালের একটা নিয়ম, শেষ বয়সে বিনাশ হবে—তিনি আর মুহূর্ত দেরি করবেন না ভাবলেন। তখনই মনে হল, কেউ ফের ডাকছে। বিনোদবাবু, গার্ড, বিনোদবাবু। আরে মশাই রবীনবাবু আত্মহত্যা করলেন কেন? সারাটা রাত যে তিনি ঘুমোতে পারেন নি, রবীনবাবুর আত্মহত্যার কালে মুখটা কেমন না জানি দেখাচ্ছিল—দিন কাল পাল্টে যাচ্ছে মশাই, বুড়ো মানুষদের আর থাকা ঠিক না, সব পাল্টে যাচ্ছে। তিনি বললেন, বিনোদবাবু 'আমাকে ডাকছেন?'

—'শুনেছেন ?'

—'কী ?'

—'রবীনবাবু লাস কাটা ঘরে গায়েব।'

—'গায়েব !'

—'গায়েব।'

—'মরা মানুষ নিয়ে টানাটানি !'

—'গায়েব হয়ে গেল লোকটা। ভুতুড়ে ব্যাপার !'

একবার বানের জলে দুটো অজগর ভেসে এসেছিল। এবং অতিকায় সেই পাইথন জাতীয় সাপ দুটোর চামড়া তার শোবার ঘরে কুণ্ডুলি পাকিয়ে থাকত। লোকজন এলেই তিনি সেই পাইথনের অতিকায় চেহারার সামনে দাঁড় করিয়ে দিতেন, বলতেন তাঁর শিকার কাহিনীর কথা, ঐ যে দূরে বড় অশ্বত্থ গাছটা দেখেছেন, বানের জলে আশ্রয়হীন সাপ দুটো প্যাঁচ খেয়ে পড়েছিল। প্রায় জড়াড়ড়ি করে পড়ে থাকার মতো। কার একটা বাছুর গিলে মাদি অজগরটা নড়তে পারছিল না। মায়া। মায়া জীবজন্তুর ভেতরও আছে। বুঝলেন না, মাদি সাপটা না নড়লে ধাড়িটা যায় কি করে ! সুযোগ এসে গেল। এফোঁড় ওফোঁড় করে দিলাম। ভয়ঙ্কর। সেই ক্রুদ্ধতার সামনে দাঁড়ায় সাধ্য কার ! প্রায় দুদিন লেগেছিল মরতে। গড়াগড়ি ধ্বস্তাধস্তি অথচ মরে গেল যখন দুটোই জড়াজড়ি করে পড়ে থাকল।

ভয়ংকর সেই অজগরের ছাল দুটো সহসা গায়েব হয়ে গেছিল ঘর থেকে। থানাপুলিশ, পৃথিবীর যাবতীয় অন্বেষণ বৃথা গেল। পাওয়া গেল না। মরা মানুষ গায়েব হয়ে যাওয়া তো আরো ভুতুড়ে ব্যাপার ! এবং অজগরের ছাল চামড়ার মতো বাতাসে ওটা তা হলে এবার ভেসে বেড়াবে। মাঝে মাঝে স্বপ্নে অজগর দুটো বাতাসে ভেসে আসে। তাঁকে গিলে ফেলতে চায় ! স্বপ্নে তখন তিনি অজগর দুটোর সামনে লাঠি খেলা আরম্ভ করে দেন। এইসব ভুতুড়ে ব্যাপারে গোলাগুলি একদম অচল। লাঠি বাদে গত্যন্তর থাকে না।

তিনি এবার হাতের লাঠিটা দুবার ঘোরালেন। সিল্কের লুঙ্গি, সিল্কের পাঞ্জাবী, কিছুদিন আগে সোনার একটা চেন থাকত গলায় —সৌখিন মানুষ। বড়বৌ, প্রেম ভালবাসা, এবং শ্যালিকা মাধুরী সব বিগত ব্যাপার। শুধু সম্বল এই লাঠি। অথচ হিজল তার বিল নিয়ে বেশ আছে। স্টেশন আছে। বড়বাবু, ছোটবাবু, সবাই আছে। কি মনে করে আজকাল সোনার চেনটা গলায় আর পরেন না। শরীর থেকে এক এক করে সব খুলে রাখছেন। তিতির শিকারে গেলে মন্দ হয় না। ট্রেনটা হুইসিল দিচ্ছে। সবুজ নিশান উড়ছে পেছনে। গাড়িটা লাফাতে লাফাতে প্ল্যাটফরম ছেড়ে চলে গেল। সামনে একটা পর্দার মতো ঝুলে ছিল এই ট্রেন, এখন একেবারে ফাঁকা। শুধু আদিগন্ত মাঠ, বর্ষার জল, এবং নমু আরতি দাদু দাদু করছে। ওদের সঙ্গে যেতে হবে। এবং বিকেলে, হিজলের বিলে নৌকা ঠিক। পাটাতনে ফরাস পাতা। পালের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। বেশ বড তিনমাল্লা নৌকা। তিন জন মাঝি। আর দিনটাও মনোরম। বৃষ্টি নেই। আকাশ নীল, সূর্য মাথার ওপর থেকে নেমে গেছে। জ্যোৎস্না উঠবে রাতে। রুনু ঝুনু সঙ্গে যাচ্ছে! যে যার যত দামী পোশাক পরে নিয়েছে। বড়কর্তা শিকারের পোশাক পরেছেন। মৃগাঙ্কর সঙ্গে বড়বৌর এক সময় বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। আসা-যাওয়া ছিল। কোথায় সব যে হারিয়ে গেল।

পালে বেশ হাওয়া লেগেছে! মৃগাঙ্ক অধীর এ-পাশে, মাঝখানে দুটো বন্দুক, এবং তিনি গলুইর দিকে। পাছার দিকে মেয়েরা ছেলেরা। ওরা অতিসব তুচ্ছ ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। যেন দেরি এলেই পাড়ে ওরা লাফিয়ে পড়বে, তারপর ছুটবে। বন্য স্বভাবের হয়ে যেতে পারে। যেমন শ্যামলা মেয়েটা পরেছে লাল টকটকে রঙের সিল্ক। জাপানী পুতুলের মতো মেয়েটি পড়েছে সাদা সিল্ক। রুনু ঝুনু পরেছে মুর্শিদাবাদী। বাতাসে ওদের আঁচল উড়ছে। পাশে তিনজন সদ্য যুবক, এক মাথা চুল, চোখে উত্তাপ। সহসা অকারণ জোরে হেসে উঠছে। দুটো একটা রসিকতা করছে নিচু গলায়।

মৃগাঙ্ক বলল, ‘বড়দা আপনার শরীরটা ভাল নেই?’

—‘না না, বেশ ভাল আছি।’

—‘একটা কথা বলছেন না।’

—‘আর বলিস না। স্টেশনের নতুন বড়বাবু এয়েছেন। সন্ধ্যায় দেখা করতে আসবে। চলে এলাম। বোধ হয় ঠিক করিনি।’

—‘কোনো জরুরী কাজটাজ…’

—‘দা…দু!’

তিনি পেছনের দিকে তাকালেন।

—‘দ্যাখো অমল কি দুষ্টুমী করছে।’

এত তাড়াতাড়ি হয় কি করে। এই তো নৌকায় উঠে আলাপ। রুনুটা এরই ভেতর এত তাড়াতাড়ি! তিনি ভারি গলায় বললেন, ‘কোনো দুষ্টমী চলবে না ভাইয়েরা। ভারি খারাপ জায়গা। নৌকা ডুবে গেলে হাঙ্গরে-টাঙ্গরে খেয়ে নিতে পারে।’

দাদু ভারি মজার কথা বলছে—‘কত বড় হাঙ্গর দাদু!’

—‘বড়। খুব বড়। বাবা, কি বড় গহ্বর। দেখলে ভয় লাগে।’

ওরা আরও মজা পাচ্ছিল। নমুর বাবা অধীর বাইনোকুলারে কি দেখছে।

—‘ওগুলো কি পাখি।’

মৃগাঙ্ক বলল, ‘জল পিঁপি।’

—‘সুস্বাদু।’

—‘তবে হয়ে যাক।’

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনাথবাবু চমকে ওঠার মতো বললেন, ‘আরে না না। বন্দুকের শব্দ পেলেই সব পালাবে। জায়গামতো হবে। এখন দৃশ্যাবলী দ্যাখো।’

—‘বা…বা।’

আরতিকে কে আবার দৃশ্যাবলী দেখাচ্ছে! এরা কোথায় শিক্ষা পায়! গুরুজনের সামনে তো ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না মতো

থাকতে হয়। আরে কি আছে ভেতরে আমরা টের পাই না! বুড়ো জিবে জল বেশি ওঠে। পুষ্ট সব রেখেছ। হাত দাও, কাম কাজ কর। আড়ালে আবডালে। এত ভাল লাগছে কেন, বিলের দৃশ্য, অথবা শাপলা শালুকের ফুল, জলজ ঘাস, তা তোমরা ভালই বোঝ। এবং সামান্য খিস্তির বাসনা জন্মাল। গর্ভস্রাব কথাটা উচ্চারণ করতে পারতেন। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। গতকাল থেকেই রবীনবাবু, সেই মৃত অজগরের লাস, এবং স্টেশনের নতুন বড়বাবু ভারি জ্বালাচ্ছে। সন্ধ্যায় যদি না আসে, তবে সকালের দিকে তিনি নিজেই স্টেশনে চলে যাবেন। বলবেন, আরে স্টেশনের জন্ম থেকে আছি। স্টেশন আর বাড়ি, বাড়ি না প্রাসাদ, প্রাসাদই বলা ভাল—সব এক সঙ্গে।

এমন একটা উলঙ্গ পৃথিবীতে বাড়ি যত সামান্যই হোক প্রাসাদ বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। দু মহলা বাড়ি। ওদিকে গ্রাম নদীর কাছাকাছি। সেখানে পাড় ভাঙছে। নদী পাড ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে আসছে। গ্রাস করার মতলব। ওদিকে কিছু বাগদির বাস। ওরা পাড় ভাঙলে আবার সহজেই আবাস গড়ে নিতে পারে। মৃগাঙ্কদের বড় বাড়িটা এ-অঞ্চলে আর একটা দেখবার মতো বাড়ি। তবু প্রতিপক্ষ মৃগাঙ্করাই তার সব। আভিজাত্য কোনোরকমে দু বাড়ি বজায় রাখার চেষ্টা করছে এখনও। স্টেশনে বাবুগোছের মানুষ নামলে বোঝা যায় দু বাড়ির কেউ হবে। আর সব চাষাভূষা মানুষদের দল। হাঁস-মুরগি বেচে খাবার মতো তাদের অবস্থা। তবু এমন একটা জায়গা বড়কর্তা শ্রীনাথবাবুর যৌবনকালে বড় ভাল লেগেছিল।

তখন নৌকা বেশ চলছে। পালে আরও জোরে হাওয়া লেগেছে। ছপ ছপ বৈঠা পড়ছে। হালে অবিনাশ আছে। জলে ছলাত ছলাত শব্দ। ছোট ছোট ঢেউ আর জলরাশির ভেতর দিগন্তের কাছাকাছি সেই ঘেরির ঘাস জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। প্রায় দু ক্রোশের মতো রাস্তা। প্ল্যাটফরম, স্টেশনের লাল ইটের বাড়ি, সিগন্যালিং পোস্ট সবই চোখে ছোট হয়ে আসছে। যত ছোট হয়ে আসছে ততো মনে হচ্ছে একটা

গাড়ি এগিয়ে আসছে। গাড়িটা তারে ঝুলে কেমন যেন চলে যাচ্ছে দূরে। দূরে দূরে ক্রমে হিজলের বন স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। জ্যোৎস্না রাতে ঘেরিতে যৌবনে বড় বৌ এবং তিনি, ছোট ছইএর মতো আবাস। টুনের বাবা রান্নাবান্না করত। এখানে সাদা জ্যোৎস্না খেলা করে বেড়ালে বড় বৌকে নিয়ে পাড়ে পাড়ে ঘুরে বেড়াতে কি যে ভাল লাগত। সব মনে পড়ছে। এবং বড় বৌর সামান্য নষ্টামী ছিল বলে ভালই লাগত। বড় বেশি মহার্ঘ মনে হত। বড় বৌ···। মাধুরী···।

—'মামা ঐ যে দেখা যাচ্ছে।'

তা দেখা যাবে। এখনই জলে ঝাপ দেবে না। খুব সন্তর্পণে নামতে হবে। ওরা টের পেলেই উড়ে যাবে।

এবং বড়বাবু হাতে সময় রেখে একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা ঝেড়ে ফেললেন। তিতির শিকারে ভারি কৌশলী হওয়া দরকার। নতুবা একটাও পাওয়া যাবে না। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হবে। ঘাসে জঙ্গলে লুকিয়ে রাখতে হবে শরীর। সাপখোপের ভয় প্রচণ্ড। বিষাক্ত সাপেরা, সব মাঠে জলে ডুবে যায় বলে ঘেড়ির পাড়ে উঠে আসে। কাঁকড়ার গর্তে নতুন আবাস তাদের। ঘাসের ভেতর ঘোরাফেরা করতে পারে এবং খুব নির্বিকার। বরং মানুষ মানুষ দেখলেই অবাক হয়ে যায়। এরা কারা, সহজেই ফোঁস করে উঠতে পারে।

সাপের কথা শুনে আরতি নমু কেমন ঘাবড়ে গেল। অধীর চক্রবর্তীর পাইপ খাওয়া বন্ধ। যেন নৌকা থেকে তারা নামবেই না। রুনু ঝুনু মৃগাঙ্কের অভ্যাস আছে। এবং নৌকা ভিড়লে রুনু ঝুনু যখন লাফিয়ে পাড়ে নেমে গেল, টানে—টানে সেই তিনজন সভ্য যুবক নেমে গেল পিছু পিছু। মৃগাঙ্ক নামল শেষে, এবং মাঝি তিনজন বাদে আর কেউ থাকল না নৌকায়। আসলে এক আশ্চর্য প্রলোভনে পড়ে যায় মানুষ। এমন ঘাস মাটি, ধানের চাষ আর পাখির নিরন্তর আকাশে ওড়া, দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি, জীবনেও তারা দেখেনি। কেমন মুহ্যমানের মতো আরতি বলল, 'আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে কুশল।'

একটু দূরে মৃগাঙ্ক। অধীর চক্রবর্তী এগোচ্ছে। রুনু ঝুনু আরও আগে। নমু বোধ হয় খুব বাপ সোহাগী, বাপকে ছাড়া থাকছে না। কেবল পেছনে তিনি, এবং কাছাকাছি আরতি আর কুশল। আর তখন এমন সব কথাবার্তা ওরা গোপনে বলবে বেশি কি। মৃগাঙ্ক হাতে ইসারা করলে সবাই বসে পড়ল, এত কাছে পাওয়া যাবে! সূর্য অস্ত যাচ্ছে বলে পাড়ের ছায়া ঢালু জমিতে নেমে গেছে। কতদূরে চলে গেছে ঘেরির পাড়, আরও দূরে অস্পষ্ট অন্য সব ঘেরি চোখে ভেসে উঠছে। মৃগাঙ্কই প্রথম ফায়ার করল। গোটা ছয়েক হবে উড়ছে, গোটা তিনেক ভাল উড়তে পারছে না। ঘায়েল হয়েছে, ছররা খেয়ে লটপট করছে এবং ছেঁড়া ঘুড়ির মতো সাদা পাখনা ঝুলে পড়েছে। পাশে সব পাড়ে পাড়ে কাশের জঙ্গল। অদূরে নমু নেমে গেছে। একটা ছোটাছুটি পড়ে গেছে। প্রায় লুটের বাতাসার মতো এখন সংগ্রহ করা। ওরা ছুটতে ছুটতে এক একজন এক এক দিকে নেমে যেতে থাকল। অধীর চক্রবর্তী চিৎকার করছে, আরতি ঐ ছ্যাখ। জঙ্গলের ভেতর পড়ে যাচ্ছে। অধীর মৃগাঙ্ক অথবা নমু সব দিক সামলাতে পারছে না। ঘেরির মাঝখানে প্রায় দুটো পাখা ভাসিয়ে পড়ে আছে। অধীর প্যান্ট খুলে ফেলেছে। জাঙ্গিয়া পরেই সে লাফিয়ে পড়ল জলে। মাঝিরা এ-সবে অনায়াসে সাহায্য করতে পারত। তিনি ভাবলেন, একবার ডাকবেন নাকি—অবিনাশ, যা বাবুদের শিকার তুলে দিয়ে আয়। কিন্তু ওরা খুব দূরে এখন। এতটা দূরে গিয়ে তিনি খবর দিতে পারবেন না। আর এসেই এত সহজে মিলে যাবে কে জানত! খোঁজাখুঁজি। তারপর তাক বুঝে এবং অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। অধীর চক্রবর্তীর নসিব ভাল। নতুবা এতগুলি একসঙ্গে। তিনি শুধু দেখছেন। বড় বৌ তিতিরের মাংস রান্নার সময় কখনও কাঁদত। বিধবা মাধুরীকে নিয়ে সংসারে একটা অশান্তি। তিনি নিজে যা সহজে সহ্য করেছেন বড় বৌ তা সহজে সহ্য করে নিতে পারল না। হাতের বন্দুক তুলে দুবার তাক করলেন। সব বারই দেখছেন মৃগাঙ্কের

বুক বরাবর হয়ে যায়। তিনি বন্দুক নামিয়ে রাখলেন। এবং কিছুটা সত্যিকারের বুড়ো মানুষের মতো একটু ফাঁকা জায়গা দেখে বসে পড়লেন। তখন লটপট করছে একটা বড় পাখি। মাথা ঘুরে পড়ে যেতে যেতে ও আবার আকাশে ওড়ার চেষ্টা করছে। নিচে সেই আরতি আর কুশল, এদিকে ছুটে আসছে। এই অতিকায় ঘেরির চারপাশে, যেখানে যে কেউ খুশি এখন মরা তিতির খুঁজে বেড়াচ্ছে। পাড়ে পাড়ে কাশের জঙ্গল, সেই হেতু কারুর মাথা হাত পা দেখা যাচ্ছে, কখনও কিছুই দেখা যাচ্ছে না। রুনু ঝুনু পর্যন্ত ওদিকের পাড়ে সব গাছের আড়ালে পড়ে গেছে।

তিনি ডাকলেন, 'রুনু ঝুনু!'

ওরা কেউ জবাব দিচ্ছে না।

সূর্য অস্ত যাবে। তারপর জ্যোৎস্না রাত। মৃগাঙ্ক কি ফাঁদ পেতেছে। বুড়ো মানুষ, অথচ অহংকার—এটুকুতে ঘাবড়ে গেলে হাসা-হাসি পড়ে যাবে।

তবু আবার ডাকলেন, 'রুনু ঝুনু।'

কেউ কথা বলছে না। কেবল দূরে অধীর চক্রবর্তী জলে সাঁতরাচ্ছে।

তা নমু পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। আরতি কেমন বাহ্যজ্ঞান শূন্য এত কাছে বড়কর্তা, দাদু, দাদুই তো তবু ছেঁড়া ঘুড়ি ধরার মতো আরতি আর কুশল যেন পাল্লা দিচ্ছে। যত দূরেই যাক, যত ঘন জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে পড়ুক, ওটা ধরে আনবেই।

তিনি বসে থাকতে পারছেন না। পিছু পিছু নাবালকের মতো ছুটতে চাইলেন। অথচ পারছেন না। পিছলে পড়ে যাচ্ছেন। এবং কি হবে তিনি যেন জানেন। কাশবনের ভেতরে ওরা ঢুকে যাচ্ছে। হাত কুড়ি দূরে কাশ-বনের ভেতর পাখিটা পড়ে গেছে। এখন শুধু খুঁজে দেখা। এবং ক্রমে ওরা সেই ঘন জঙ্গলে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকলে, তিনিও হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেলেন।

এক আশ্চর্য লোভ শরীরে থেকে যায়। আসলে সকালের সেই শ্যামলা মেয়ে কেমন উদ্দাম নৃত্যমালায় নাচতে নাচতে চোখের ওপর দিয়ে চলে গেল। ছলাকলা জানে এরা। পাখি খোঁজার নামে এমন নিরিবিলি একটা জায়গা, অথচ কোনো অতিকায় অজগর যদি ধেয়ে আসে, আসলে তিনি এমনভাবে কাশের জঙ্গলে হামাগুড়ি দিচ্ছিলেন, যেন অতিকায় অজগর হয়ে খাবার বাসনা তাঁর। জিভ লক লক করছে। চোখ জ্বলছে। শ্বাপদের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছেন আসল শিকার।

৪

পালে আবার হাওয়া লেগেছে। মৃত সব পাখিরা গলুইয়ে পড়ে আছে। রক্তাক্ত শরীর। কোনোটার ঘাড় ভেঙ্গে গেছে। কোনোটার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে গেছে। কোনোটা এখনও পাখা ঝাপটাচ্ছে। তিনি বুঝতে পারছেন, এরা একটাও তিতির না। সবগুলো বালিহাঁস। পুরুষ্ট শরীর সবুজ নীল ছাই রঙে মেশামেশি। তিতির অত উড়তে পারে না। অত বড় হয় না।

মৃগাঙ্ক বলল, 'বড়দা গোটা তিনেক তুমি নাও।'

বড়কর্তা জবাব দিলেন না। যেন ফেরার সময় তিনি নিজের ভেতর নেই। খুব বেশি বুড়ো হয়ে গেছেন। চোখ সাদা, চুল সব সাদা, ভ্রূ পেকে গেছে। আয়না থাকলে বোধ হয় তক্ষুনি দেখতেন মুখ। মুখে সব বলিরেখা প্রকট হয়ে গেছে। জীবন বড় ভারবাহী জন্তু। এবং বোধ হয় জ্বর আসছে।

অধীর চক্রবর্তী বলল, 'খেতে খারাপ হবে না।'

তিনি এবার বললেন, 'তিতিরের চেয়ে খেতে ভাল।'

যুবতীরা সব ছই-এর ওপাশে। ওরা হাঁসগুলোর ওপর উপুড় হয়ে আছে। পেট টিপে দেখছে ডিম আছে কিনা ভেতরে। আরতির

জায়গায় জায়গায় শরীর কেটে গেছে। সে যতটা পারছে শরীর ঢেকে রেখেছে। অধীর চক্রবর্তী দেখলে আঁতকে উঠতে পারে—আরতি তোর শরীরে ওগুলো কিসের দাগ রে। আঁচড়ে খামচে দিলে যেমন হয়। সে অবশ্য তার জবাব ঠিক রেখেছে। ওগুলো বাবা কুশপাতার দাগ। কেটে গেছে।

জ্বর সত্যি আসছিল, সবুজ সেই ঘন কাশের জঙ্গলে মৃত শ্বাপদের মতো চুপি চুপি তিনি যুবক-যুবতীর খেলা দেখেছেন। অনন্ত আকাশের নিচে কাশের বন দুলছে। সাপখোপের ভয় ডর নেই কারো। কেমন এক অতীব আকাঙ্ক্ষা ভেতরে। এবং সেই জলে জঙ্গলে ধরণী চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে। জননী জন্মভূমির মতো চাষ আবাদের ফসল তুলে দিচ্ছে ঘরে। এক আপ্লুত শরীর ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। দুজন আদিম যুবক-যুবতী ঘন জঙ্গলের ভেতর কি যে সব করছিল। তিনি টের পাচ্ছিলেন জ্বর আসছে। বয়সে সব মরে যায়, অথচ তিনি টের পাচ্ছিলেন অক্ষমতা তাঁকে ছিড়ে খাচ্ছে। তাঁর ভেতরে রক্তপাত ঘটছিল।

আরতি একটা মরা হাঁস তুলে ওপরে ঝুলিয়ে বলল, এটাকে আমি আর কুশল খুঁজে বের করেছি। পাখিটা হাতে ঝুলিয়ে রেখেছে। একটা পা ধরে রেখেছে আরতি। সবাই দেখছিল। আরতি বলল, সবচেয়ে বড়।'

কুশল বলল, 'ভেতরে একটা অজগর ছিল।'

কুশল কি তাকে দেখতে পেয়েছে! আরতি পড়ে ছিল ঘাসের ভেতর! তার দেখতে পাবার কথা না। উল্টে পাল্টে খাচ্ছিল কুশল। নতুন বলে ঠিকঠাক জানা নেই—অথবা কতটা কিভাবে তুলে নিতে হয় ভাল জানে না। ভয়ও থাকতে পারে। সন্তর্পণে সে সব টের পেয়েছে হয়তো। এবং তখনই মনে হয় জ্বরটা বাড়ছে। একটা বুড়ো মানুষকে ভয় কি! এবং ঠিক জড়পদার্থ ভেবে ফেলেছে হয়ত। অথবা এই সব সবুজ ঘাস জঙ্গলের মতো তাকে ভেবে ফেলছে।

—'অজগর!' নমু চমকে উঠল।

মৃগাঙ্ক বলল, 'অজগরের তো খেয়ে দেয়ে কাজ নেই।'

কুশল শুনতে পাচ্ছিল ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। সে বলল, 'সত্যি। চোখ দুটো কেবল দেখতে পেয়েছি। ভীষণ জ্বলছিল।'

রুনু ঝুনু বলল, 'সত্যি!'

অমল না কি নাম যেন, সে বলল, 'যা জায়গা, থাকা বিচিত্র না।'

অধীর চক্রবর্তী বলল, 'তুমি ঠিক দেখেছ?'

কুশল একটা পাখা ছিঁড়ে ফেলল পাখির। কান চুলকাল। বলল, 'ঠিক দেখেছি। সবটা দেখিনি। চোখ দুটো অজগরের না হয়ে যায় না। মানুষের মতো মুখ।'

এবার অধীর চক্রবর্তী কেমন হা হা করে হেসে উঠল।—'তোমরা যে কি আজকাল হয়েছে। সব ব্যাপারে ঠাটা।'

আরতি বলল, 'থাকতেও তো পারে।'

শ্রীনাথবাবু কেমন অধীর চোখে মুখে বসেছিলেন। যেন তক্ষুনি ডেকে বলবেন, থামাও। আমি নেমে যাব।

এবং বয়সী লোক বলে মৃগাঙ্ক শ্রীনাথবাবুর শরণাপন্ন হলেন, 'বড়দা তোমার কি মনে হয়?'

তিনি বললেন, 'হতে পারে। বানে বন্যায় কোথা থেকে কি চলে আসে কেউ বলতে পারে না।'

সবাই খুব গম্ভীর হয়ে গেল।

নেমে যাবার সময় মৃগাঙ্ক অবিনাশকে বলল, 'বড়দার বাড়িতে রেখে যাবে।' প্রায় তিনটে বড় বালিহাঁস একপাশে রেখে দিল।

শ্রীনাথবাবু নেমে গেলেন। একটা কথা বললেন না। জ্যোৎস্না রাত, প্ল্যাটফরমের বাতিগুলো জোনাকিপোকার মতো জ্বলছে। সোজা তিনি উঠে যাবেন ভাবলেন। এবং কিছুটা পালিয়ে, যদি প্ল্যাটফরমে ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাঁকে হয়তো ধরে নিয়ে যাবে, এই যে

আমাদের বড়কর্তা, স্টেশনের প্রথম থেকে সব দেখে এসেছেন। কত গল্প জানে হিজলের।

তিনি সোজা গেলেন না। ঝুমু ঝুমু প্রায় এক প্রবাস জীবন থেকে যেন ফিরে এসেছে। নেমেই উজ্জ্বল প্রজাপতির মতো উড়ে উড়ে নিমেষে চোখ থেকে হারিয়ে গেল। বুড়ো মানুষটার জন্য কারো আজ আর কোনো টান নেই। এবং তখনই মনে হল সাঁ সাঁ বাতাস বইছে। নীল নক্ষত্রমালার নিচে প্রবল ঝড়ের মতো বাতাস হিজলের দিকে ছুটে যাচ্ছে। কেমন একাকী, দূরে প্ল্যাটফরম, কোয়ার্টার এবং রেলিঙে দু একজন যাত্রী হয়তো, স্পষ্ট কিছুই নেই, সামনে ইট সুরকির পথ, কত-দূরে যেন চলে গেছে—শেষ নেই এবং তখনই মনে হল, গায়েব হয়ে যাওয়া লাস রবীনবাবু বাতাসে ভেসে আসছে। গুলিতে আহত পাখির মতো বাতাসে লটপট করছে। তিনি শব্দে টের পান, আসছে। দ্রুত ছুটে আসার সময় হাতের লাঠি ঠিক তরবারির মতো উঁচিয়ে রেখেছেন সামনে। ভেতরে ঢুকেই ডাকলেন, 'টুনে টুনে'।

সেই মাটি ফুঁড়ে উঠে আসার মতো টুনে ঠিক সামনে হাজির। তিনি অপলক তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর কি ভেবে যেন বললেন, 'বড়বাবু এসেছিল ?'

টুনে বলল, 'আজ্ঞে না হুজুর।'

ক্রমশঃ জ্যোৎস্না তখন বাড়ির চারপাশে পিছলে যাচ্ছে। দুটো একটা পাখির শব্দ পেলেন। লাঠি ঝুলিয়ে দিলেন দরজার পাশে। জামা খুলে প্যান্ট খুলে সেই সিল্কের লুঙ্গি পড়লেন। তা হলে এল না। চুপচাপ ইজিচেয়ারে বসে থাকলেন। টুনে তামাক দিয়ে গেল। চা খাবে কিনা, সন্ধ্যায় চা খাওয়ার অভ্যাস, দেরি হয়ে গেছে বলে যেন বলা, চা চলবে কিনা অসময়ে—তিনি হ্যাঁ বা হুঁ কিছু বললেন না। কেবল যেন একটা ট্রেন দ্রুত চলে আসছে। ট্রেনে করে তাঁর কোথাও যাবার কথা।

ক্রমে তিনি মাংসের গন্ধ পেলেন। শিকারের পাখি রান্না হচ্ছে। বেশ ঝাল ঝাল গন্ধ ম'ম' করছিল। কেমন বমি পাচ্ছে তাঁর। কিছু ভাল লাগছে না। বরং ছাদে বসলে সব থেকে দূরে থাকবেন ভেবে ওপরে উঠে গেলেন। কেমন মায়াবী এক জগৎ চারপাশে। বড় একা। কেউ কাছে নেই। নিচে রুনু ঝুনুর গলা পাওয়া যাচ্ছে। প্লেটে দু'টুকরো মাংস ওরা চেখে খাচ্ছিল বোধ হয়। বৌমা একবার উঠে এল। এখন খেতে দেওয়া হবে কিনা না আরও পরে—এ সব বললে, তিনি বললেন, 'শরীরটা ভাল নেই বৌমা। কিছু খাব না ভাবছি।' তারপর কি ভেবে একা একা নিচে নেমে গেলেন। তেমনি লাঠিটা হাতে। এখন পৃথিবীর কে কোথায় কিভাবে বেঁচে আছে দেখার বাসনা বুঝি।

একটা লোক তখন বলে যাচ্ছিল, নদী এবারে ভীষণ পাড় ভাঙছে। কে লোকটা! জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট টের করতে পারলেন না। দুপাশে এখন ধানের মাঠ। মাঝে এই রাস্তা। স্টেশনের দিকে উঠে গেছে। আজ সন্ধ্যায়ও ছোটবাবু এলেন না, বড়বাবু এলেন না। ভারি অপমান বোধে চোখ মুখ লাল হয়ে উঠছে। স্টেশন, প্ল্যাটফরম, জ্যোৎস্নায় হিজলের সব পুরোনো গল্প তাকে মাতালের মতো অস্থির করে তুলছে। এই প্রথম একজন বড়বাবু স্টেশনে এসে তার সঙ্গে দেখা না করে নির্বিঘ্নে কাজ চালিয়ে যেতে পারছেন।

পাশের কোয়াটারগুলোর দরজা বন্ধ। তিনি হেঁটে যাচ্ছেন, অথচ কেউ দরজা খুলে দু দণ্ড কথা বলার জন্য আসছে না। স্টেশনটা কেমন নীরব। ল্যাম্পপোস্টের নিচে পয়েন্টসম্যান চুপচাপ বসে আছে। দু একজন লোক ইতস্তত ঘুরছে প্ল্যাটফরমের ওপর। আর কোনো শব্দ নেই, না কোনো ট্রেনের, না কোনো মানুষের। হিজলের বিলে দু

চারটে জেলে নৌকা মাছ মারার জন্য বের হয়েছে। নিশীথে লণ্ঠন ঝুলছিল নৌকায়। আর একটু হেঁটে গেলে বড়বাবুর অফিস। কেমন এক আকর্ষণে তিনি চুরি করে বড়বাবুকে দেখতে চলে এসেছেন।

তিনি কাউণ্টারের সামনে মুখ রেখে আড়ালে দেখছেন বড়বাবুকে। ঘরে সাদা আলো। সব বর্ষার অজস্র কীটপতঙ্গ এসে জড়ো হয়েছে। যুবক মতো মানুষটিই বড়বাবু; বেশ দেখতে। মুখোমুখি বসে আরও দুজন। পেছন থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবু তিনি জানেন, একজন ছোটবাবু হবে, অন্য কে আছে আর। বোধ হয় লোকটি তার অপরিচিত। চোখ কুচকে গেল তার। এরা বেশ জমিয়ে বসেছে: এমন একটা রাতে তিনি একা। অন্য সব দিনের মতো তার বৈঠকখানায় দাবা অথবা পাশাখেলা জমে ওঠেনি। কখনও চা, কখনও খাবার, এমনকি সবার জন্য আজ পাখির মাংস হতে পারত।

ছোটবাবু সহসা মুখ ফেরাতেই মনে হল, কেউ চলে যাচ্ছে। মনে হল, সেই অকৃত্রিম মানুষটি বড়কর্তা।

—আরে বড়কর্তা যে! আসুন আসুন।

ছোটবাবু দেখছেন, হন হন করে হাঁটছে মানুষটা। লাঠিতে ভর করে হাঁটছে। সেই জোর আর নেই। বেঁচে থাকার তীব্র ইচ্ছে মানুষের মরে গেলে যেমন হয়ে থাকে। সে দৌড়ে গেল।—বড়কর্তা।

শ্রীনাথবাবু দাঁড়ালেন। হাতের লাঠিটা ফের বগলদাবা করে দেখাতে চাইলেন, এখনও বুড়ো হননি। প্রায় যুবকের মতো এখনও দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন।

— আসুন বসবেন।

বড়কর্তা কিছু বলছেন না।

—আজ স্টেশনেই বসেছি। একদম হাতে সময় নেই।

সময়, কিসের সময়, কার সময়, সময় খুব দীর্ঘ বুঝি!

—হেড অফিস থেকে মিঃ চৌধুরী এসেছেন।

—আঃ। বড়কর্তা একটা বড় রকমের নিশ্বাস ফেললেন।

—আজ কথা ছিল যাবার। চৌধুরী আসায় আর যাওয়া হল না।

অঃ। বড়কর্তা যেন সবটা এতক্ষণে ক্রমে বুঝতে পারছেন।

—চলুন, এবার না হয় স্টেশনেই আলাপ হোক।

—মন্দ না তিনি ফিরলেন।

—আপনার কথা বলেছি। বলেছি, ঐ যে বড় বাড়িটা দেখছেন, ওটা আমাদের সবার বড়কর্তার বাড়ি। স্টেশন, স্টেশনের মানুষগুলো তাঁর প্রাণ বিপদে আপদে তিনিই আমাদের সব।

কিছুটা বুঝি হাল্কা বোধ করছেন শ্রীনাথবাবু। এখনও তিনি কম সহায় নন। ভেতরে ঢুকে আলাপ করলেন বড়বাবুর সঙ্গে। বড়বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কথা প্রসঙ্গে যেতে পারেন বলে দুঃখ প্রকাশ করল। বলল, সময় করে উঠতে পারিনি একেবারে। আপনি তো শুনেছি, সবার আগে টের পান ট্রেন কতদূরে আছে—কত লেট হবে।

বড়বাবুর কিঞ্চিৎ বিষণ্ণতা কেটে গেল। তিনি বললেন, এতদিনের একটা অভ্যাস।

ছোটবাবু বললেন, স্টেশনের যা কিছু সবই এঁর হাতে। সবই তো বলেছি

ছোটবাবু তবে সবই বলে দিয়েছে কতকাল আগে একটা মনের মতো কাজের ভার নিয়ে তিনি এখানে এসেছিলেন। চুক্তি শেষ হলে কাজকর্ম দেখে রেলের বড়সাহেব বলেছিলেন আরে মশাই করেছেন কি। একেবারে ছবির মতো দেখতে সব কিছু।

—বাড়িটাও এখানে করে ফেললাম। আর কোথাও যাব না ভাবছি।

বড়সাহেব দেখেছিলেন, শ্রীনাথবাবুর সুন্দর বাড়ি। এমন একটা জায়গায়, এই স্টেশন এবং বাড়ি আশ্চর্য এক নিসর্গ ছবির মতো। শ্রীনাথবাবুর রুচির প্রশংসা করেছিলেন।

আসলে ওরা কেউ জানে না, একটা কাজের ভেতর মানুষের কখনও কখনও অতীব গভীর এক প্রেরণা থাকে। হয়তো এই হিজলের বিল, এবং তার বন্য স্বভাব, অথবা বর্ষার ভয়ংকর জলরাশি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

বড়বাবু শ্রীনাথবাবুকে চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। বলল, ইনি এসেছেন গতকাল। কাজকর্ম বেড়ে গেল। একেবারে সময় করতে পারলাম না।

মিঃ চৌধুরী উঠে দাঁড়াল তখন। বলল, বসুন। কাল যাব ঠিক করে রেখেছিলাম। এখানে এসে আপনার সঙ্গে দেখা হবে না সে ঠিক না!

বড়বাবুর ভেতর রিন-রিন করে যে দুঃখটা বাজছিল, ওটা ক্রমে কমে আসছে। এরা কাজের লোক। অহেতুক অপমানবোধ খারাপ। আর তখনই বড়বাবু বলল, মিঃ চৌধুরী এসেছেন রিপোর্ট সংগ্রহ করতে ...ওরে দয়াল কোথায়...চা লাগা...বড়কর্তা এসেছে...

ঘরে নানা বর্ণের কীটপতঙ্গ উড়ে আসছে। বাইরে তেমনি জ্যোৎস্না। ভেতরের আলোর ভোল্টেজ সামান্য কমে সহসা আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। আর তখনই বড়বাবু বলল, স্টেশন এখান থেকে সরিয়ে নেওয়ার কথা হচ্ছে। ওদিকে গঙ্গা এগিয়ে আসছে, এদিকে ময়ূরাক্ষীর ক্যাচম্যাণ্ট এরিয়া. যে-কোনো সময় বিপর্যয় ঘটতে পারে।

চৌধুরী তখন ঝুঁকে আছে নকসাতে। কিছু চুল কপালে! সামান্য হাওয়া চুল এলোমলো করে দিয়েছে। মুখটা ভাল দেখা যাচ্ছে না। মুখের ওপর এলোমেলো চুলে ঝাপসা মতো। যেন একটা ভয়ঙ্কর মাকড়সা জাল বুনে যাচ্ছে মুখের ওপর। শ্রীনাথবাবুর চোখে ক্রমে সব কিছু অস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

মাথায় বাজ পড়ার মতো তিনি শক্ত হয়ে গেলেন। সব রক্ত প্রবাহ মুহূর্তে কেউ যেন থামিয়ে দিয়েছে। শরীরে বিন্দুমাত্র আর শক্তি

নেই। আড়ষ্ট। এবং কাঁপছিলেন। লাঠিটা খুঁজে পেলেন পাশেই। উঠে দাঁড়ালেন।

—আচ্ছা উঠি। কাল যাবেন। কোনো দিকে তাকালেন না। সামনে সেই ধূসর হিজলের বিল। এবং ক্রমে এক অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষ তিনি। কপালে হাত দিলেন। জ্বরটা আবার বাড়ছে। তবু জ্যোৎস্নায় একবার ছাদে উঠে শেষ বারের মতো কেন জানি দেখার ইচ্ছে, হিজলের এই স্টেশন, এই মাঠ, গাছপালা. অথবা রবীনবাবুর মুখ। বাতাসে কি সব এ'কে এ'কে ভেসে আসছে --তিনি শ্বাস নিতে পারছেন না। বুকে ভার কষ্ট। ছাদে উঠতেই মনে হল হাত দুই ওপরে আকাশ। তারাগুলি অনেক কাছে নেমে এসেছে। লাঠি তুলে আকাশ ছুঁতে চাইলেন। পারলেন না ফের বললেন, জীবন বড় ভারবাহী জন্তু হে। এত কাছে আকাশ অথচ ছুঁয়ে দেখতে পারছেন না। বুড়ো অথর্ব হয়ে গেছি। কেঁদে ফেললেন তিনি, বৌমা, রুনু ঝুনু, আই য্যাম ওল্ড। আমি বুড়ো হয়ে গেছি। লাঠিটার ওপর এবার তিনি সত্যি নির্ভর করার জন্য ঝুঁকে দাঁড়ালেন। মাথার ওপর তেমনি আকাশ, নীল নক্ষত্রমালা, রহস্যময় শূন্যতা।

৬

ধীরেন জীপ থেকে নামতেই শুনল আজ বাড়িতে পাখির মাংস রান্না হচ্ছে।

জীপ গ্যারেজে রেখে ধীরেন সিঁড়ি ধরে ওঠার সময় মাংসের ঘ্রাণ পেল এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, দোতলার বারান্দায় কে হেঁটে যায়। বাবা হতে পারে, রুনু কিংবা ঝুনু অথবা ললিতা যে কেউ হোক, মাংসের ঘ্রাণটা সত্যি প্রবল। সারাদিন ঘোরাঘুরি করে ফেরায় বেশ খিদে পেয়েছে। এখন স্নান, তারপর ফুলকো লুচি আর পাখির মাংস।

দোতলায় উঠে আসতেই ঝুনু বলল, বাবা, আমরা আজ পাখি শিকার করে এনেছি!

ধীরেন মেয়েকে দেখল এটি তার ছোট মেয়ে। শান্তিনিকেতনে দিদির সঙ্গে পড়াশোনা করে। সে ভাবল, এ সময় এটি তার ছোট মেয়ে এমন কথা কেন মনে এল! দিদির সঙ্গে পড়াশোনা করে কথাটাই বা কেন ভাবল! অবশ্য এ-সব প্রশ্ন ঝুনুকে করা যায় না। ধীরেন শুধু বলল, তোমার মা কোথা? আপাতত সে ঝুনুর বাবার মতোই কথা বলল।

মা তো মাংস রান্না করছে।

মার রান্না করা খুব স্বাভাবিক নয়। ললিতা রান্না করে না। রান্নার লোক আছে। ললিতা কাছে দাঁড়িয়ে শুধু দেখিয়ে দেয়। প্রেসারে রান্না হয় মাংস। ভাপের একটা আলাদা গন্ধ আছে। তার শরীরে ঘাম। আঠা আঠা শরীর। ফ্যানটা ফুল স্পীডে চালিয়ে দেওয়া দরকার। ধীরেন মেয়েকে ফ্যানটা ফুল স্পীডে চালিয়ে দিতে বলল। সারা বাড়িতে আজ সাদা জ্যোৎস্না। ছাদে বসে পাখির মাংস মন্দ না।

বাবাকে দেখছি না!

দাদু বোধ হয় ছাদে গেছে।

বাবার শরীর ঠিক আছে।

হুঁ। দাদুই ত নিয়ে গেল। মৃগাঙ্কদাদু অধীরবাবু আমি দিদি সবাই গেছিলাম।

ধীরেন একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিল! ফুরফুরে হাওয়া গঙ্গা থেকে উঠে আসছে। আম, জাম, নারকেল বাগান পার হয়ে হাওয়া আপন মর্জি মতো বইছে

শরীরে চর্বি জমা। সব সময় জামা আঁট হয়ে যায়। গঙ্গা থেকে জোরে হাওয়া উঠে এলে এত গরম লাগত না এখন ইচ্ছে করলে জামাটা খুলতে পারে। ললিতা নিজেই রান্না করছে ভাবতে কেমন

খটকা লাগল। অনেকদিন অভ্যাস নেই। গরমে, এত কষ্ট করে ললিতা কার জন্য রান্না করছে। পাঁচ-সাত বছর আগে ললিতা ভাল-মন্দ রান্না করে খাওয়াতে ভালবাসত। তখন শরীরে তার এত চর্বি ছিল না। জামা বানালেই আঁট আঁট মনে হত না। শরীরটা বেশ হাল্কা ছিল। দম ছিল অনেক। এখন একটুকুতেই হাঁপিয়ে ওঠে।

একবার তোমার মাকে ডাক না।

মা তোমাকে ডাকছে। ঝুনু বারান্দা থেকে চিৎকার করে বলল।

এ কি অসভ্যতা! এখান থেকে ডাকলে শুনতে পায়!

রুনু ও-ঘর থেকে বের হয়ে এসেছে। রুনু পরেছে সাদা সিল্কের লম্বা ম্যাক্সি। চুল ব ব করা ভারি সুন্দর হয়েছে মেয়েটা। ছোটটা ক্ষীণাঙ্গী। বড়টা দীর্ঘাঙ্গী। মুখে ললিতার ছাপ আছে।

তোমার দাদু কোথায় যেন বললে? ধীরেন ঠাণ্ডা হয়ে প্রশ্ন করল।

বোধ হয় ছাদে গেছে।

তোমার দাদুর মেজাজ কেমন?

রুনু বলল, খুব ভাল।

ধীরেন জানে তার বাবার মেজাজ ভাল নেই। সকালে উঠে জিপ বের করতে গিয়েই টের পেয়েছে। বাবা তাকে বলেছেন, এবারে জনগণের কাজ না করে নিজের কাজ কর। আমি আর কদিন!

ধীরেন বুঝেছিল স্টেশনের বড়বাবু দেখা করতে আসে নি। স্টেশনে বড়বাবু নতুন এসেছেন। আজ তিন-চারদিন হল তিনি বড়বাবু হয়ে এসেছেন, অথচ স্টেশনের লাগোয়া বাড়ির একচ্ছত্র অধিপতি শ্রীনাথ-বাবুর সঙ্গে দেখা করা নেই—বড়ই বেয়াদপ। এই প্রথম একজন বড়বাবু শ্রীনাথবাবু নামক এক আত্মম্ভর মানুষের কাছে নিজের পরিচয় দিতে এল না। চটে লাল হয়ে আছেন। সে সেটা সকালেই টের পেয়েছে। এখন ফিরে এসে কোন্ মেজাজ দেখতে পাবে বুঝতে পারছে না।

তখনই ঝুনু বলল, জান বাবা, কুশল না আজ অজগর দেখেছে।

ধীরেন অবাক্। হিজলের বিলে আবার একটা অজগর সাপ দেখা দিয়েছে। সে কিঞ্চিৎ ভয়ও পেল। তার মেজাজ সামান্য তিরিক্ষি হয়ে গেল। প্রথমে সে জানেই না কুশলটা কে। সে কেন হিজলে গিয়েছিল। হিজলের কোথায় সেই অজগর সাপটা দেখেছে! হাজিদের ঘোরতে, না তার ঘেরিতে। এখন ত বর্ষাকাল। হিজল জলে জলময়। সমুদ্রের মতো। যেদিকে দু চোখ যায় শুধু জল। রেলের বাঁধ ছুঁয়ে জল এখন ফুলে ফেঁপে আছে। খুব বড় বৃষ্টি কিংবা বান-বন্যা হলে ছোটনাগপুরের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে কোন ময়াল সাপ-টাপ ভেসে আসতেই পারে। ময়ুরাক্ষী দ্বারকা, ব্রাহ্মণী সব নদীর এটা জল বের হবার বিশাল একটা ঢালু উপত্যকা, অঝোরে বৃষ্টি না হলে হিজলে জল থাকে না। চৈত্র-বৈশাখে নদীগুলি শুকিয়ে খটখটে। তখন হাজার হাজার গরু-বাছুর নেমে আসে দূরবর্তী গাঁ গঞ্জ থেকে। ডেরা বাঁধা হয়। মোষের পিঠে চড়ে আসে রাখালেরা। দু-চার মাসের চাল, ডাল, নুন, তেল সঙ্গে থাকে। বর্ষাকালে ঘোরি-গুলিতে সামান্য ডাঙ্গা আর জঙ্গল। আর সব ডুবে যায়। দু-একটা হিজল গাছ। তার ফুল-ফল। এ-হেন জায়গায় কেন যে বাবা মেয়েদের নিয়ে পাখি শিকারে গেছিল! কাজেই গলায় উষ্মা, বাবার দেখছি যত বয়স বাড়ছে তত ভীম-রতিতে ধরছে। কুশলটা আবার কে?

কুশলকে চেন না! মৃগাঙ্কদাদুদের বাড়ি বেড়াতে এসেছে। কলকাতায় থাকে।

কুশল তোমাদের সঙ্গে গেছিল!

কুশল, অমল, নমু, আরতি দঙ্গল বেঁধে গেছি।

কখন গেছিলে।

সকালে।

ফিরলে কখন?

বিকেল হয়ে গেছিল। বিশ্বাস না হয় দিদিকে জিজ্ঞেস করে দেখ না!

ধীরেনের ঘাম শুকিয়ে উঠছে ভেতরে। শরীর ঠাণ্ডা। এ সময়ে স্নানের ঘরে যাওয়া যায়। সর্দি-গর্মির ভয় থাকে না। সে জামাটা খুলে ফের ভাবল কুশলটা কে? এই কুশলই কি সর্বত্র এখন মেয়েদের জন্য বড় হচ্ছে। আগের মতো মেয়েরা বাবার জন্য তেমন যেন মায়া বোধ করে না। এই যে সে সারাদিন ঘুরে ঘুরে জনগণের সেবা করে ফিরল. কোন্ কোন্ ডাকসাইটে অফিসার তার সঙ্গে দেখা করেছে, তাদের নিয়ে সে কোথায় নির্যাতিত মানুষের উদ্ধারকার্য সম্পন্ন করেছে সে বিষয়ে এতটুকু আগ্রহ নেই। তার কেমন কষ্ট হচ্ছিল।

রুনু বলল, কুশল আরতির বন্ধু।

এটা গ্রাম জায়গা। এখানে শুধু কোলাহল যা সামান্য রেল স্টেশনে। তারপর লাল ইট-সুড়কির একটা পথ চলে গেছে গাঁয়ের দিকে। হিজলের বিল পার হয়ে আসে নৌকা। বেল বাঁধে নৌকাগুলো লেগে থাকে। রাঢ় থেকে আসে মন মন ধান। সেগুলো সড়ক পথে কিছুটা যায় নদীর ধারে। নদী ধরে আবার ওপারে। এই নদীর ঘাটে সকালে বাজার বসে সেখানে তার ধান-চালের আড়ত আছে। সে একাই সবকটা আড়তের মালিক। রেল কোয়ার্টার পার হলে রেল লাইন আর নদীর ফাঁকা জায়গাতে বিশাল এক ধানের মাঠ। সেখানে দাদুর নামে স্কুল। বাবা তাঁর বাবাকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য বিশ-বাইশ বিঘা জমি স্কুলকে দিয়ে দিয়েছেন। সুন্দর গাছপালা এবং ফুলের বাগানে স্কুলটা আশ্রমের মত। সেটার ভালমন্দ সেই দেখে। হেড মাষ্টারের জন্য হাল-ফ্যাশনের কোয়ার্টারও করে দিয়েছে সে। ধীরেনবাবু গরীবের বাপ-মা। সবাই ছোটবাবু ছোটবাবু করে। ছোটবাবু যা করবে তাই। কেবল এই সংসারটাতে তার দাম নেই। এক একজন এক এক রকমের। কুশল বলে নতুন আবার একটা উৎপাত এবং এই ভয়ে সে কিঞ্চিৎ মুখ গোমড়া করে রেখেছে। ললিতা

আজ সারাক্ষণই রান্নাঘরে—এটা তার পক্ষে ভাবা খুবই কঠিন হয়ে পড়ছে। কুশল আরতির বন্ধু। আরতিটা কে।

সে স্নানে যাবার আগে দেখল গোলাম এ-ঘরে উঁকি দিয়ে দেখছে। গোলাম কিছু বলে না।

গোলাম উঁকি দিলেই টের পাওয়া যায় নীচে কেউ এসে বসে আছে। সারাক্ষণ কেউ না কেউ তার সঙ্গে থাকেই। বড় ব্যস্ত মানুষ। এই ব্যস্ততা মেয়েরাও টের পায়। ওদের পক্ষে এই জন্যই খুব সুবিধা—কুশল নামে কাউকে সংগ্রহ করা। পাখি শিকারে যায়, কে মত দেয়। বাবা দিলে সে কিছু করতে পারে না কারণ বাবা তার জন্যই সব রেখে যাচ্ছে। তার কোন বিরোধী পক্ষ নেই। শরিক নেই। সে এজন্য বাবাকে ঘাটায় না। বারান্দার লাগোয়া বাথরুম। বাবা রাগ করে এই বাথরুমটা নাতনিদের জন্য করে দিয়েছেন। সব চেয়ে হালফ্যাসনের বাথরুম এটা। এমন কি কমোড আছে, ফ্লাস আছে। সাওয়ারের ব্যবস্থা করেছেন। দেয়াল ডিসটেম্পার। রঙিন মীনে করা চীনেমাটির কাজ বাথরুমে। আগের বাথরুমটা এক-তলায়। নাতনিরা বাথরুমে ঢুকলে নাকি বের হতে চায় না। বাবা প্রায়ই এই নিয়ে অভিযোগ করতেন। রুনু-ঝুনু তরুণী হয়ে ওঠার পর বাবার কাছে একটা বড় সমস্যা দেখা দেয়, বাথরুমের দিকে গেলেই মনে হয় ভেতর থেকে কেউ দরজা বন্ধ করে রেখেছে। এবং তখন টের পাওয়া যায়, কে আর হবে, তুই নাতিনের এক নাতিন। যখন এতই বাথরুম-প্রীতি, যেমন এ-বাড়িতে ললিতার শান্তিনিকেতন প্রীতি আছে তেমনি এই বাথরুম-প্রীতি বোধ হয়। বাবা নাতনদের সব সখ মেটান। আর এত সামান্য সখ। যেমন সখ কুশল নামে এক যুবকের সঙ্গে ঘেরির কাশবনে ঘুরে বেড়ানো পাখি শিকারে যাওয়ার আসল কারণটা এই কুশল। ভিতরে বড় যুদ্ধ দেখা দেয় এবং কুশল নামক ব্যক্তিটি এক প্রতিদ্বন্দ্বী

বাথরুম হবার পর ধীরেনের পিতৃদেব শ্রীনাথবাবু নাতনিদের ডেকে বলেছিলেন, কেমন পছন্দ?

রুনু বলেছিল, খুব সুন্দর হয়েছে।

ঝুনু বলেছিল, একটা খুঁত থেকে গেছে।

পিতৃদেবের কাজে খুঁত থাকে না। তিনি কথাটাতে ভীষণ চটে গিয়েছিলেন। তোরা আমার খুঁত ধরবি। বল কি খুঁত আছে?

ভাল করে দেখ, টের পাবে।

শ্রীনাথবাবু বুঝতে পারলেন না। তাক করে দিয়েছেন। সুগন্ধ তেল, শ্যাম্পু সাবানের কেস রাখার একটি কাচের প্লেট বসানো তাক। চারপাশে এনামেলের বর্ডার। মোজেইক ফ্লোরে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়ে আঁতকে উঠেছিলেন, সবই ত দেখা যায় দেখছি। ভেতরের রক্ত-মাংস পযন্ত। তিনি বুঝছিলেন, মেঝে, দেয়াল এতটা মসৃণ করা ঠিক হয়নি। তখন ঝুনু বলেছিল, কি ধরতে পারলে না।

পিতৃদেব তাঁর টাক মাথায় হাত রেখে বললেন, আমার বয়স হয়েছে তাই বলে আমাকে তোমরা সেকেলে ভাব কেন।

ঝুনু বলল, তুমি খুব সেকেলে!

সেকেলে বললে দাদু ভীষণ রেগে যায়। একটা মওকা পাওয়া গেছে ভেবে দুই বোনই হাততালি দিচ্ছিল আর সেকেলে সেকেলে বলছিল। আসলে পিতৃদেব মনে করেন, তিনি এখনও একজন বুড়ো যুবক। তাঁর রুচিবোধ ভারি সৌখীন। এই যে বাড়িটা তারই প্রমাণ। পেছনে আম, জাম, কাঁঠালের বাগান, তারপর মাঠ, তারপরে কিছু ভূমহীন মানুষের ডেরা, শেষে নারকেল বাগান এবং শ্মশান নদীর পারে। মানুষের সেবা এবং বিশ্রামের জন্য সব যেমন ঠিক রেখেছিলেন, তেমনি সামনে রেল ইস্টিশন, পুরোণো অশ্বত্থ গাছ, রেলের মালগুদামের ঘরবাড়ি, সিগনালিং পোস্ট, এবং রেল-লাইনের নিচ থেকেই হিজলের বিশাল বিল আরম্ভ। ছাদে দাঁড়ালে, নিঝুম সাদা জ্যোৎস্নায় হিজলের জলরাশি ভারি গাম্ভীর্য সৃষ্টি করে। এই যাঁর রুচি, তাঁকে বলছে নাতনিরা সেকেলে। একটু চটেই গিয়েছিলেন, কিন্তু নাতনিরা তাঁর এখন সব। তিনি ছোট নাতনিকে খুশি করার জন্য বললেন, তোমরা

শান্তিনিকেতনের ছাত্রী। রবিঠাকুর বড় মানুষ। তাঁর ছোঁয়া তোমাদের গায়ে আছে। সুতরাং খুঁতটা কি জানালে ভাল হয় না ?

ঝুনু এক মাথা চুল ঝাঁকিয়ে বলেছিল, আয়না কোথায় ?

বাথরুমে আয়না! প্রায় যেন আচমকা তিনি ভয় পেয়ে গেছিলেন। এমন অশ্লীল কথা বাবা যেন জীবনেও শোনেন নি। বাথরুমে আয়না কেন ? ঘর নেই ? সেখানে আয়নায় মুখ দেখবে। এ-আবার কেমন আবদার। তিনি ভয়ঙ্কর বিব্রতবোধ করেছিলেন সেদিন। তবু নাতনিদের কাছে হেরে যাবার মানুষ নন। কি রকম আয়নার দরকার তোমাদের এমন বলেছিলেন।

একজন বলেছিল, গোল আয়না।

একজন বলেছিল, লম্বা আয়না।

গোল আয়না লম্বা আয়নার সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে প্রশ্ন করতে বাবার বোধহয় সংকোচ হচ্ছিল। বৌমার সঙ্গে এ-বিষয়ে পরামর্শ করা যেতে পারে। কিন্তু তিনি কি ভেবে বউমার সঙ্গে পরামর্শ করার চেয়ে চুপচাপ থাকা পছন্দ করেছিলেন। দুই নাতিনের জন্য দেখা গেল দুই রকমের আয়না হাজির। একটা গোল মতো, আরটা লম্বা মতো। যার যেমন খুশী আয়নায় মুখ দেখবে। এবং এ-বিষয়ে তিনি কারো মত না নিয়ে রাজমিস্ত্রির সঙ্গে কথা-বার্তা বলেছিলেন। বাথরুমে আয়নার ব্যবহার কবে থেকে শুরু হয়েছে রাজমিস্ত্রি হয়ত বলতে পারে। সেসব জানার জন্য গোপনে কিছু কূট প্রশ্নও করেছিলেন।

এই বয়সে ধীরেন মাঝে মাঝে বাথরুমে ঢুকে বুঝতে পারে কনু ঝুনুর বয়সে এই আয়নাটা থাকলে নিজেকে আরও ভাল ভাবে দেখা যেত। তার খবরই সে পায়নি। আজকালকার মেয়েরা কত খবর রাখে। বাড়িতে মাংস, কি পাখির মাংস জিজ্ঞাসা করা হয়নি। এ-সময়টা তিতির পড়ে বেরিয়ে। বালিহাঁস উড়ে আসে। আর কিছু না পেলে ডাহুক, জলপিপি শিকার করা খুব সহজ। তাছাড়া সারস জাতীয় এক রকম পাখি সন্তর্পণে বসে থাকে জলে ডাঙ্গায়। এ-জাতীয়

পাখির মাংস খেতে খুবই সুস্বাদু। চকাচকি বড় একটা পাওয়া যায় না। তবে সে শুনেছে মৃগাঙ্ক কাকা নাকি গতবার নদীর চরা থেকে ছুটো চকাচকি শিকার করে এনেছিল। মৃগাঙ্ক কাকা বাবার মতোই সৌখীন মানুষ। তাঁর শ্যালক অধীর সরকারী অফিসের সাহেব সুবো মানুষ। সেবারে নাকি শ্যালকের আসার কথা ছিল। প্রতি বছরই একবার করে লিখত, আসবে। এবারে বোধহয় এসেছে। কারণ বাবা বলেছিলেন, এক ভদ্রলোক তিন-চারটা কুকুর নিয়ে ফার্স্ট ক্লাস কামরা থেকে গতকাল নেমে ট্যাপার বাড়িতে গেছে। মৃগাঙ্ক কাকার ডাকনাম ট্যাপা। ওর বাথরুমেই হাসি পেয়েছিল। এমন একটা সৌখীন পড়তি জমিদার, যিনি ছোটলাটকে এনে রায়বাহাদুর হয়েছিলেন, তাঁর নাম ট্যাপা হয় ভাবতে বড় বিস্ময় লাগে।

ছোটবাবু স্নানে যাবে আগেই টের পায় গোলাম। গোলামের একটা চোখ নেই। মা শীতলার কৃপায় গেছে। ডিমের সাদা অ্যালবুমিনের মতো চোখটা সব সময় জ্বল জ্বল করে। যেন যে কোন সময় চোখটা সর্দির মতো খসে পড়তে পারে কোটর থেকে। ললিতা গোলামকে প্রথম দেখে আঁতকে উঠেছিল। ভাগ্যিস গোলাম তখন খুবই তরুণ। বীভৎস মুখ। বসন্তের দাগ এবড়ো-খেবড়ো করে রেখেছে মুখটা। নাকটা বসা। থুতনি নেই বললেই হয়। হাঁ করলে মুখের মধ্যে লাল একটা ক্ষুধার সাম্রাজ্য আছে টের পাওয়া যায়। সংসারে যা কিছু পড়তি, সব গোলাম একা খেয়ে ফেলতে পারে। বাসি পচা তার কিছুতেই আটকায় না। আর শরীরে অসুরের মতো শক্তি। বৈঠকখানায় শুয়ে থাকে। রাতে বাড়িটা ভূতের মতো পাহারা দেয়। তখনই ধীরেন মোটরের শব্দে টের পেল, ট্যাংকে ঠাণ্ডা জল পাতাল থেকে উঠে অসছে। এই ঠাণ্ডা জলে স্নান, তারপর আর কি থাকে, বৈঠকখানায় লোকজন, টি আর টিপ ছাপ, কুইন্টাল কুইন্টল গম, শীতের কম্বলের হিসাব, বীজধানের হিসাব এ-সব শেষ করে যখন উঠে আসে তখন দেখতে পায় ললিতা ঘুমিয়ে পড়েছে।

বছর তিনেক হল ললিতা খাট আলাদা করে নিয়েছে। সে মোটা হয়ে গেছে বলে মাঝে মাঝে মনে হয় ললিতা লাবণ্যময়ী।

ধীরেন স্নান করতে করতেই নিজেকে দেখল। সত্যি ভারি গোলগাল হয়ে গেছে। ডাক্তারের পরামর্শ মত খাওয়া-দাওয়া কমাতে পারছে না। বাড়িতে সব সময় পাখির মাংস রান্না হলে সে কি করে! কিছুটা অভাব থাকলে বোধহয় ভাল ছিল। অন্তত অভাবের একটা চিন্তা থাকত। অভাবের জন্য মাথা গরম থাকত, মাথা গরম থাকলে শরীর গরম থাকে—তাতে কিছু ক্ষয় থাকে—কিছুই যদি না থাকে তবেত শরীরে চর্বি জমবেই। শরীরের আর দোষ কি।

বাথরুমের আয়নাটায় এখন শরীরের সবটাই দেখা যাচ্ছে। ললিতা নিজেকে দেখে, দেখে কি ভাবে কে জানে। মেয়েরা এত বড় হয়েছে, ললিতাকে দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না। যেন তিন বোন মিলে এখন একসঙ্গে বড় হচ্ছে। এবং এই বড় হওয়ার কথা ভাবতে গিয়ে ধীরেনের মনে আবার ধন্দ দেখা দিল, কার জন্য আবার নিজের হাতে রান্না করছে! কেউ কি বাড়িতে আজ খাবে?

৭

রুনু ঝুনু প্লেটে মাংস নিয়ে টানা ঝুলবারান্দায় একটু টেস্ট করে দেখছে। ললিতা প্যানট্রি থেকে মুখ বার করে রেখেছে। কেমন হল জানতে চায়।

রুনু বলছে, থাম না মা! কি গরম, মুখেই দেওয়া যাচ্ছে না। নরম জিভে গরম এমনিতেই বেশি। তারপর ঝাল-মশলা গাঢ় কুসুমের মতো মাংসের সঙ্গে লেগে আছে। অবিরাম ফুঁ দিচ্ছিল, এবং সামান্য ঝোল জিভে দিয়ে বলল, গ্র্যাণ্ড। পাখির মাংস বড়ই সুস্বাদু। এই সুস্বাদু মাংসের আহার বড় তৃপ্ত করছিল দু'জনকে।

রুনু সন্ধ্যায় গাছতলায় বসেছিল, পাখির পালক ছাড়ানো দেখছিল। সেই কখন থেকে সবাই যেন সংসারে খাব খাব করছে। বালিহাঁস তিনটির কোথায় ছর্‌রা লেগেছে রুনু ঝুনু উল্টে-পাল্টে দেখেছে। একটার বুকে, একটার মাথায়, অন্যটার তলপেটে। তিনটের একটাকে কুশল আর আরতি ঝোপ থেকে তুলে এনেছিল। কারণ ঝাঁকের পাখিরা গুলি খেয়ে কে কোথায় উড়ে যাচ্ছিল ; কে কোথায় গিয়ে গড়িয়ে পড়েছে, আর কখন পাখি ধরার জন্য ছুটোছুটি শুরু হয়েছিল সেটা যেন মনে করতে পারছে না। দাদু ঘেরির পাড়ে চুপচাপ বসেছিল। অধীরবাবু হামাগুড়ি দিয়ে ওঠে আসছে। নমু আরতি জিনসের প্যান্ট পরেই হাঁটু জলে নেমে পাখি তুলে আনার জন্য ছুটেছিল। এতগুলি পাখি, একসঙ্গে মরে যায় গুলী খেয়ে, তারা তিনটে এনেছে, অধীরবাবুরা নিয়েছে গোটা ছয়েক। শিকার থেকে ফিরে এলে অধীরবাবু আর মৃগাঙ্ক-দাদুকে মা বলেছে, কুশল আর অমল কাল এখানে খাবে। আপনারাও খাবেন। সঙ্গে আরতি আর নমিতা। এই চারজন দুপুরে এখানে খাবে। পাখির মাংসটা মা বোধহয় আজ কাউকে দেবে না। ফ্রিজে তুলে রাখবে। এখন এই সময়ে আর একটু চেয়ে নিলে মন্দ হয় না। কারণ মা চায় তার হাতের পাখির মাংস রান্না খেয়ে সবাই বলুক হ্যাঁ, রান্না বটে। তারা প্লেট এগিয়ে দিয়ে বলেছে আর একটু দাও মা।

ললিতা এখন স্নানে যাবে। গরমে ঘামছিল। স্নান করলে শরীর ঠাণ্ডা হবে। সেই অজগর সাপটার কথা মনে হল তখন ললিতার। ভাল করে জিজ্ঞেস করা হয়নি। বড় মেয়েকে ডেকে বলল, কুশল সত্যি অজগর সাপ দেখেছে!

ও তো তাই বলল। আর একটু দাও মা।

মিছে কথা।

রুনু বলল, জানি না মা কেউ দেখলে আমরা কি করব। আর একটুকরো।

কুশল দেখল, তোরা দেখতে পেলি না? মা কিছুতেই মাংসের কথায় আসছে না।

ঝুনু শাড়ি পরেছে। শাড়িতে বড় বেশি লম্বা দেখা যায়। এই গরমকালে ঝুনুরও বাথরুমে যাবার দরকার হবে। মা কথা বলছে দেখে সে বিরক্ত হচ্ছিল। আজগুবি কথা নিয়ে মা'র এখন মাথা গরম। যেন মেয়েরা রক্ষা পেয়ে গেছে। অজগর সাপটা কত বড় না আবার জিজ্ঞেস করে। আর দিদিরও হয়েছে তেমনি। মাকে কেন যে অজগর সাপটার কথা বলতে গেল! কাল কুশল আর অমল এলে সে ভেবেছিল নৌকায় করে আবার হিজলের বিলে চলে যাবে। এই বিলে না গেলে বোঝা যায় না আকাশটা কত বড়। সে মাকে তাড়া লাগাল, যখন দেবে না তাড়াতাড়ি চানে যাও না মা। বাবার হয়ে গেছে।

রুনু বলল, মার হলে আমি যাব।

না আমি।

এই মেয়েদের হয়েছে বেশ। সব কিছুতেই একজন আর একজনের পেছনে লেগে আছে। এখন উভয়ে শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ভালবাসে।

ঝুনু বলল, ছাখ মা দিদিটা না কি পাজি। বলে দেব।

কি বলবি?

গোলামকে তুমি ক'টুকরো মাংস দিয়ে দিলে।

আমরা খাব, ও খাবে না!

ললিতা বলল, এর থেকে ভাগ!

বারে ও কত কষ্ট করে ছাড়াল, তাই দিলাম। কি রাক্ষস, বলছে দিদিমণি ওগুলো হাটকাবে না। ওগুলো আমি আলাদা রান্না করে খাব। এই দেখে রুনুর কষ্ট হয়েছিল। পাখির ছাল-চামড়া, নাড়ি-ভুঁড়ি গোলাম একটা কলাপাতায় আলাদা করে রেখেছিল। পুকুরে নিয়ে পরিষ্কার করে খাবে। রুনু দেখছিল, পাখির ছাল পালখ ছাড়াবার

সময় গোলামের সর্দি চোখটা যেন বেশি চকচক করছে। দেখে দেখে অভ্যাস হয়ে গেছে বলে, এখন আদৌ উৎকট লাগে না। বরং যে চোখটা ভাল আছে, সেটা ওর কাছে আরো বেশি জীবন্ত। একটা চোখে লোভ-লালসা বড় বেশি ধরা পড়ে। রুনু তাই গোপনে ওকে পাঁচ-সাত টুকরো মাংস কলাপাতায় আলাদা করে দিয়েছে। ঝুনুকে বলেছে, মাকে আবার বলিস না।

বাথরুমে কে আগে যাবে এই নিয়ে বিরোধ বাধতেই ঝুনুটা বিশ্বাসঘাতকতা করে ফেলল। বাড়িতে এত আছে অথচ কাউকে মা কুটোগাছটি দিতে চায় না। রুনুর এটা পছন্দ না। বয়েস কম বলে, একটুতেই মনের মধ্যে সুড়সুড়ি লাগে। সে বলল, দিয়েছি বেশ করেছি। অত মাংস কে গিলবে।

ললিতা বলল, পাখির মাংস কখনও বেশী হয়।

সত্যি পাখির মাংস বেশি হয় না। খুব কপাল বলতে হবে ঘেরিতে এত বালিহাঁস উড়ে এসেছিল। সকালে মৃগাঙ্ক-দাদু না এলে শিকারে যাওয়ার কথাই উঠত না। দাদু মাঝে মাঝে ট্রেনের গার্ড রবীনবাবুকে তিতির শিকারের নিমন্ত্রণ করত। সদর থেকে সাহেব-সুবোরা এলে দাদু ঘেরিতে নিয়ে যেতে চাইত জোর করে। দাদুর ঐ হয়েছে। কত জাঁকজমক নিয়ে বেঁচে আছে মানুষটা সেটা দেখবার জন্য বড় উদ্‌গ্রীব। তিনি একজন অধীশ্বরের মত বেঁচে থাকতে চান। সকাল থেকে মেজাজ-মর্জি তিরিক্ষি ছিল। আরতি নমু সঙ্গে যাবে শুনে, দাদু বলেছিল, তা'লে চল যাই। আমি কিন্তু এখন আর পাখি মারি না। পাখি মারা ছেড়ে দিয়েছে দাদু, বোধহয় রাতে পাখির মাংসও খাবে না। গতকাল দুপুরের ট্রেনে হাজিরা দিয়ে প্রায় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছিল দাদু। বলেছিল, ও বৌমা, বৌমা শুনছ, রবীনবাবু আত্মহত্যা করেছে।

বৌমা রবীনবাবুকে চেনে। বৌমা, এ-বাড়িতে অতিথি অভ্যাগতদের জন্য সকাল থেকে উপর-নীচ করতে পারে। সুতরাং

বৌমা খুব বিস্মিত গলায় বলল, এমন হাসিখুশী মানুষটা গলায় দড়ি দিতে পারে।

আসলে সবাই এক আত্মহত্যার দিকে ঝোঁকে—এই যে পাখি শিকার, এই যে ঘেরিতে আর কেউ দেখল না, কেবল কুশল আর আরতি ঝোঁপের মধ্যে ঢুকে গিয়ে অজগর সাপ দেখে ফেলেছে, সবটাই প্রায় যেন নিয়তি। রবীনবাবুরও নিয়তি। রুনু মাংসের প্লেটটা টেবিলে রেখে এসে দেখল, গোয়ালবাড়ির পাশে বড় কাঁঠাল গাছটার নিচে কিছু যেন জ্বলছে—জোনাকিপোকার মতো। দুটো চোখ হবে, ইচ্ছে করলেই এই দুটো চোখ, গোলামের চোখ, একটায় সর্দি ঝরছে, অন্যটায় ভালবাসা, প্রেম এবং খুনী আসামীর মত যখন যা দরকার—এই করে রুনু দু-পা ফাঁক করে রেলিং-এ উবু হয়ে দেখল, আসলে ওখানে কেউ আগুন জ্বেলেছে। জোনাকি পোকা নয়। গোলাম কি, মাংসের ঘ্রাণ পেয়ে আর ধৈর্য ধরতে পারেনি। কাজকাম সেরে খাবে, এতটা বোধহয় তার অপেক্ষা করার সময় নেই। গোয়ালবাড়ির পেছনে, গাছের নিচে পুকুরপাড়ে এখনই আগুন জ্বেলে মাংস পুড়িয়ে খাচ্ছে। উত্তুরে হাওয়া দিলে চামসে পোড়া গন্ধটা এ-বাড়িতেও আসত। দক্ষিণা বাতাসে টের পেয়েছে, কখন ছুটি দেবে ছোটবাবু ঠিক কি, তার আগে, পাখির মাংস একটু ঝলসে নিয়ে নুন মাখিয়ে খেয়ে নিলে হয়। কেউ টের পাবে না।

গোলামের এতটা রাক্ষসেপনা রুনুর ভাল লাগল না। আগুন না জোনাকি এবং ঝুলবারন্দা থেকে কিছুই বোঝা যায় না বলে, সে তরতর করে নেমে গেল নিচে। সাদা ম্যাকসি মাটিতে লুটাচ্ছে। চুল উড়ছে। কেউ মাংস পুড়িয়ে খায় গোলামকে দেখলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে না। সে সব পারে। এবং গোলাম রুনুর বড়ই আজ্ঞাবহ। রুনু রেগে গেলে গোলামকে কানে ধরিয়ে ওঠ-বোস করায়। কারণ গোলামের একটা সরল চোখ, অন্যটা ভীষণ চোখ, দুই চোখের মাঝখানে গোলামের বসবাস, রুনু বয়স বাড়ার সঙ্গে টের পেয়েছে।

রুনু বাড়ি এলে, গোলাম এ-বাড়ি ছেড়ে যেতেই চায় না। সকাল সন্ধ্যা সব সময় এই গোলামের বড় দরকার রুনুর।

গোলাম কাঁঠাল পাড়বি।

কোন্ কাঁঠাল।

বড় গাছের কাঁঠাল।

দেখব পেকেছে কিনা ?

দেখ।

এবং সত্যি গোলাম গাছে একটা ঠিক পাকা কাঁঠাল পেয়ে যায়। যেন সে জানে রুনুদিদির কি কখন দরকার। কাঁঠাল নামিয়ে গাছের নিচেই বলবে, বাড়ি, না এখানে।

ভাঙ না।

কাঁঠাল ভাঙলে দু-চার কোয়া রুনু তুলে নিয়ে ছেড়ে দেয়। তুই খা। খেতে পারবি সবটা।

রুনুদি বড়ই মসকরা করছে, মনে হয়। গোলাম খায় আর এক চোখে রুনুদির শরীর দেখে।—তুমি আর খাবে না।

আমি রাক্ষস না তোর মতো। তাড়াতাড়ি খা। কে আবার দেখে ফেলে দাদুকে বলে দেবে। দাদুর বড় ভয় তুইই নাকি তার সব শেষ পর্যন্ত খাবি।

গোলাম ঠিক কাঠকুটো জেলে মাংস পোড়াচ্ছে। পা পা করে রুনু অন্দর দেউড়ি পার হয়ে এল। সে এখন যেখানেই যাক তার জন্য কেউ খুব ভাববে না। কারণ, এ-বাড়ির চৌহদ্দি শুধু পাঁচিলটা নয়, পুকুর, গাছপালা, বাগান সহ চৌহদ্দি। তার ভেতরে থাকলে বাড়ির কেউ ভাববে না। ডাকলে সে জোরে সাড়া দিতেও পারবে।

—রুনু কোথায় তুমি।

আমি যজ্ঞিডুমুর গাছের নিচে।

—ওখানে কি করছ ?

—ঘাটলায় বসে আছি।

তা যা গরম পুকুরের ঘাটলায় রুনু একা বসেই থাকতে পারে। আর কে আছে কেউ জিজ্ঞেস করবে না' জিজ্ঞেস করলেও যদি বলে, গোলাম আছে, তবে নিরাপত্তার বিষয়ে আর কোন ভাবনা থাকে না।

সাদা জ্যোৎস্না উঠেছে। গাছপালার মধ্যে সাদা জ্যোৎস্না চুইয়ে পড়ছে। কেমন ঝাপরিকাটা এক রহস্যময়তা যা রুনু বড় হতে হতে টের পেয়েছে। আসলে আজ যা একখানা কাণ্ড হয়েছে, কেউ না দেখুক, সে দেখেছে। পাখির ঝাঁকটা প্রথমে কাশবনের মাথায় উড়ছিল, চারদিকেই উড়ছে। যে ক'টা জলে কিংবা ডাঙ্গায় পড়েছে তার জন্যে সবাই ছুটোছুটি করছে তুলে আনার জন্য। রুনু পাড়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। মাঝে মাঝে কুশল অমলকে ঠাট্টা করছিল। গুলি খাওয়া পাখিগুলো যখন ধরতে যাচ্ছে সবাই, এবং ঘেরির চারধারে কিছু মানব মানবীর উল্লাস তখনও রুনু দাঁড়িয়ে আছে। সে যেন টের পেয়ে গেছে এই পাখি শিকার করতে এসে কেউ কেউ আজ অন্য কিছু শিকারের ধান্দায়ও আছে এবং সেটা টের পেল, যখন কুশল আর আরতি ঘেরির পাড় ধরে ছুটে সামনের কাশের জঙ্গলে ঢুকে গেল। ঘেরিটা মাইলখানেক লম্বা, পাশে আধ মাইলের মত। পাড়ে পাড়ে হিজলের বন, আগাছা জঙ্গল, কাশের ঝোঁপ আর সাপ-খোপের উপদ্রব থাকে বড়। সে একবার নিজের চোখে একটা পদ্মগোখুরো দেখেছে ঘেরির জলে নিশ্চিতে সাঁতার কাটছে। যেন এর চেয়ে সুন্দর বিহারের জায়গা পদ্মগোখরোর পৃথিবীর আর কোথাও নেই। কাজেই সে তাদের মতো দ্রুত দৌড়াতে ভয় পায় এবং মনে হয়েছিল কুশল আর আরতি ঠিক টের পেয়েছে পাখিটা গুলি খেয়েছে। উড়তে পারছে না সামনে কোথাও গিয়ে লাটখাওয়া ঘুড়ির মতো পড়বে। পড়েও ছিল।

ঘন জঙ্গল প্রায় বলতে গেলে অগম্য স্থান। বোধহয় সারাদিন কাছাকাছি থাকার ফলে দুজনই বেহুশ। ওরা সহজেই পাখি খুঁজতে গভীর জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপরই নৌকায় কুশল আর আরতি। হাতে পাখিটা নিয়ে ফিরে এলে আরতির সাহেব-সুবো বাবা বললেন, এটাই দেখছি সবচেয়ে বড় পাখি। তোমরা না নিয়ে এলে বোঝা যেত না, একটা বালিহাঁস আকারে কত বড় হয়। হাঁসটা মাদি না মদ্দা তাই নিয়েও কথাবার্তা হয়েছে। দাদু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলেন। কারণ, তাঁর মনে হয়েছে, পাখি শিকারের নেশা আরও দশ বছর আগে ছেড়ে দিলে ভাল হত। দাদুর মুখ দেখে নৌকায় রুনুর এমনই মনে হয়েছিল। তারপর মুখ ফিরিয়ে যখন বড় পাখিটা দেখলেন, তখন সহজেই বলতে পারলেন পাখিটা মদ্দা। হাঁসের মাথা দেখেই টের পাওয়া যায় কোনটা মাদি কোনটা মদ্দা। আর এখন রুনুর মনে হচ্ছে আসলে দাদু ঝোপে উঁক দিয়ে আরও কিছু দেখেছিলেন। কুশল সেই চোখ জ্বলতে দেখেই হয়ত ঠাট্টা করে বলেছে, জঙ্গলটায় একটা অজগর সাপ বাস করে। ঠাট্টা আরও চূড়ান্ত পর্যায়ে গেল, যখন কুশল বলল, অজগর সাপটার মুখ যেন অনেকটা মানুষের মতো। দাদু তারপর নৌকায় আর একটা কথাও বললেন না। গোমড়া মুখে রেলের পুলে নেমে বললেন, তোমরা যাও, আমি একটু ঘুরে যাব।

রুনুর মনে হল এমন এক গোপন বনভূমি তার মধ্যেও আছে। মার আছে কিনা সে টের পায় না, তবে ঝুনুর গভীর বনভূমিটা কত বিশাল টের পাওয়া যায়। এই যে সারাদিন, পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে আমার মল্লিকা বনে যখন প্রথম ধরেছে কলি·····—এই রকমের কত গান সারাদিন সারাবেলা গেয়ে চলা, সে কোন এক অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশে যেন। আর তখনই মনে হয় একটা সর্দি চোখ, অন্যটা সরল চোখ। মা বড় যত্ন নিয়ে মাংস রান্না করছে। স্টেশনের নতুন বড়বাবু কি কাল আরও একজন অভ্যাগত?

অন্দরের দরজা খুললেই খড়ের গাদা লাইনবন্দী। বাড়িতে তিনটে জার্সি গাই। দু-জোড়া হাল. চার জোড়া বলদ। টুনের হেফাজতে গোয়ালবাড়ি। দাদুর এক নম্বরের বান্দালোক। গলায় কণ্ঠি, মাঝে

মাঝে বৈঠকখানায় দাছুর দাবা খেলার সঙ্গীরা না থাকলে সে মেঝেতে বসে চাল দেয়। টুনে কাকা নিচের আলাদা ঘরে থাকে। খায় আর ঘেরির জমি-জমার খবর দাছুকে এনে দেয়। তার কাজই ঘেরি আগলানো। ঘেরির কোন্ পাড়ে কি জঙ্গল গজিয়ে উঠছে ওর চেয়ে ভাল খবর কেউ দিতে পারে না। এমন কি তার ইচ্ছেতেই ঘেরির জঙ্গল বেশ দাবড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছে। জঙ্গলে আগাছা এবং কিছু শেওড়া গাছ হিজল গাছ প্যালা গোটার গাছ টুনে কাকাই লাগিয়ে দিয়েছে। এতে ঘেরির বাঁধ শক্ত মজবুত থাকে এবং এই করে ঘেরির পাড়ে পাড়ে এক যেন বনভূমি করে তুলেছে। মনে মনে টুনে কাকার কি ইচ্ছে কে জানে। মার ইচ্ছেতেই টুনে কাকাকে পাহারাদার থাকতে হয়। তার ঘরে বল্লম, লাঠি, কি না থাকে। বাবার ঘরে বন্দুক, টুনে কাকার ঘরে সড়কি, দাছুর ঘরে রুপো বাঁধানো লাঠি। যেন সবাই সতর্ক, কোন্ দিক থেকে বাড়িতে আক্রমণ ঘটবে কে জানে। সুতরাং এতগুলি লোক সতর্ক পাহারায় থাকলে রুনু-ঝনুর মতো মেয়েরা আয়াসে ঘাটলায় বসে থাকতে পারে। গাইতে পারে, আমায় হাত ধরে নিয়ে চল সখা, আমি যে পথ চিনি না।

জ্যোৎস্না বড উন্মাদ আজ। হাওয়ায় লিচুগাছের ডাল পাতা হুটোপুটি করছে। তার নিচে এক অপ্সরা যেন ঘুরে বেডায়। এখানে এসে দেখল রুনু কোথাও আর জোনাকিপোকা জ্বলছে না। গোলামের আহারপর্ব শেষ কি না সে বুঝতে পারছে না। একসঙ্গে সে অনেক খেতে পারে। তুপুরে সে এখানেই খায়। খড়ের গাদার পাশে টিনের থালা নিয়ে স্নান-টান সেরে এসে যখন গোলাম বসে থাকে, তখন আহার কি মধুর শব্দ বিশেষ টের পাওয়া যায়। এই খাওয়া দেখতে রুনু হাজির থাকে খাওয়া দেখতে দেখতে রুনু পাগলা হয়ে যায়। শক্ত কাঁধ, কাছিমের মতো বুকের পাটা, লুঙ্গি পরনে এবং সাবলীল এক রাক্ষসের মতো আহার করে গেলাম। ভাত ডাই করা থাকে। তার মাঝে থাকে এক গর্ত, সেখানে এক জামবাটি বিউলির ডাল পূর্ণ

ঠাকুর ঢেলে দেয়। ঐ দিয়েই সে তার আহারপর্ব শেষ করে। গোলার নিচ থেকে বড় বড় পেঁয়াজ চারখানা এনে কচ কচ করে কামড়ে খায়। রুনুর শরীর তখন শিরশির করে।

ঘাটলার কাছেই বড় যজ্ঞিডুমুরের গাছ। রাজ্যের পাখ-পাখালির বাস এখানটায়। হরিয়াল, টিয়া, বনশালিখে গাছটা ভরে থাকে। দাদুর বাড়ির কাছাকাছি কোথাও এখন কাউকে বন্দুক ছুড়তে দেয় না। কারণ, আজকাল দাদুর কী হয়েছে কে জানে পাখির কলরব শুনতে ভারি ভালবাসেন। তখনই দেখল, সামনে গোলাম, কাঠকুটো জ্বেলে উবু হয়ে বসে ফুঁ দিচ্ছে। এবং একটা মাটির মালসা, আর তাতে গোটা চার পেয়াজ কুচি করা, আদা ছেঁচে নিয়েছে। ভাঙ্গা খুরির মধ্যে কিছুটা সরষের তেল। তাহলে গোলাম মাংস পুড়িয়ে খাচ্ছে না আজ। নমু আরতিদের সেই নৌকা করে বিলে নিয়ে গেছিল। এমন শহুরে মেয়েদের সঙ্গে এক নৌকায় থাকার পর মাংস পুড়িয়ে খাওয়া হয়ত অসভ্যতা ভেবেছে। সে খুব সন্তর্পণে হেঁটে যাচ্ছে। একেবারে কাছে গিয়ে ভয় পাইয়ে দেবার জন্য হেই করে উঠল। যদি ভয় পায়, ভয় বিষয়টা অবশ্য কি গোলাম জানে না। তার কাছে জমা আছে কত কিংবদন্তী। মাঠের মানুষ হলে যা হয়, আছে নানা রকমের কেচ্ছা জমা। ভুতুড়ে কথাবার্তা হামেশাই বলে। বিলে কেউ রাতে একা থাকে না। ভুবনডাঙ্গার মালো ভূতের সঙ্গে তার নাকি প্রায়ই দেখা হয়। বিশাল বিলের জমিতে ডাঙ্গা বলতে ঐ একটা। যত বড় বান বন্যাই হোক ভুবন ডাঙ্গা নাক উঁচিয়ে থাকে। আর সাপ-খোপ অজস্র। ডাঙ্গায় মানুষের যাতায়াত নেই বললেই হয়। সেই ডাঙ্গায় নিশুতি রাতেও গোলাম যায়। গরুবাছুর ছেড়ে দিয়ে আসে। খরার দিনে মাসের পর মাস ডেরা বেঁধে থাকে। সাপেরা নাকি তার সঙ্গে কথা বলে। হেই করে উঠল রুনু অথচ অবাক, যেন শুনতেই পায়নি, উবু হয়ে কাঠে ফু দিয়ে যাচ্ছে। আহারের প্রতি এত মনোযোগ গোলামের। ইচ্ছে হল কান ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়।

রুনু এবার সামনে গিয়ে বলল, এই গোলাম বাড়ি যাবি না।

গোলাম তখনও কাঠে ফুঁ দিচ্ছে।

ধোঁয়ায় চোখ-মুখ গোলামের লাল। আগুনের আভায় রুনু সেটা স্পষ্ট দেখতে পেল। তার দিকে তাকিয়েও গোলাম যেন স্পষ্ট তাকে দেখতে পাচ্ছে না। কেমন মাংসের লোভে বেহুশ। তারপর ধীরে ধীরে ধোঁয়া কমে গেলে আগুন জ্বলে উঠল এবং সেই আলোতে দেখল রুনু, ওর কাছিমের মতো বুকে ঘাম জমেছে। রুনু দিদিমণি এসেছে। সে উঠে দাঁড়াল।

এই হয়ে গেল বলে। মাংস আর কখান রুটি।

পুর্ণ ঠাকুরের কাছ থেকে গোটা দশেক বাসি রুটি সংগ্রহ করে রেখেছে গোলাম।

তোর কখন হবে? রুনু বলল।

কি হবে দিদিমণি?

তোর মাংস রান্না।

এই হয়ে যাবে। আগুনে সেঁকে নিলেই হবে।

সেদ্ধ করবি না?

বড় কচি, সেদ্ধ করলে স্বাদ থাকবে না।

কখন খাবি?

হয়ে গেলেই খাব।

আমাকে খাবার সময় ডাকবি। বসে আছি ঘাটলায়।

কেন রুনু দিদিমণি সে বলতে পারত। কিন্তু জানে দিদিমণি তার খাওয়া দেখতে বড় ভালবাসে।

বললেই জবাব, আমি তোর খাওয়া দেখব।

গোলাম এটা ভেবেই পায় না, কেন রুনু দিদিমণি খাবার সময় রোজ সামনে দাঁড়িয়ে তার খাওয়া দেখে। সে ত রাক্ষসের মত খায়। এই খাওয়া কি মানুষের ভাল লাগার কথা। সে বড় হাপুস হাপুস করে খায়। তারিয়ে তারিয়ে খাওয়ার স্বভাব তার একদম নেই।

এতে তার একটা লজ্জাবোধ আছে। আর গবাগব করে না খেলে সে তৃপ্তি পায় না। দিদিমণি বাড়ি এলে যেন তার এই খাওয়া দেখার জন্যই সারাদিন অপেক্ষা করে থাকে। সে বলল, গরীবের খাওয়া দিদিমণি।

নে তাড়াতাড়ি কর। আগুন তো জ্বলছে। বসা।

রুনুর ঘাটলায় গিয়ে বসা হয় না। গোলাম মালসাটা বসিয়ে মাংস ছেড়ে দিল। একটু উল্টে পাল্টে সে মাছ ভাজার মতো নামিয়ে ফেলল পাখির উচ্ছিষ্ট ছাল-চামড়া, নাড়ী-ভুঁড়ি এবং ক' টুকরো মাংস।

কিছুটা ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ, মশলার ঝাঁজ নিমেষে উঠে নিমেষেই মিলিয়ে গেল। জ্যোৎস্না রাত। কলাপাতার ওপর বাসি ক'খানা রুটি, আর ভাজা ভাজা পাখির মাংস। এ-সব পাতায় রেখে বলল, তুমি বস রুনু দিদিমণি। ঘাটলা থেকে ডুব দিয়ে আসি। সাফ-সোফ হয়ে আসতে চায়। শরীর ঠাণ্ডা করে ঘাসে আসন পিঁড়ি করে বসে খাবে। জবজবে ঘাম হলে খাওয়ায় কার তৃপ্তি থাকে। রুনু বলল, যা, আমি দেখছি।

৮

ঝুনু বাথরুমে ঢুকে গেল। এই সেই বাথরুম, এই সেই লম্বা এবং গোল আয়না, যার থেকে মানুষের নিস্তার নেই। বড় হতে হতে এই আয়নাটা পিঠে ঝুলিয়ে কে যেন হেঁটে যায়। কে যেন, এই আর্শিতে বার বার তাকিয়ে থাকে।

কুশল, আমার ভাল লাগছে না।

ভাল লাগছে না কেন? কত দূর থেকে তোমাকে দেখব বলে চলে এসেছি। কতদূরে এখন কেবল চলে যেতে ইচ্ছে হয়। কেউ যেন সব সময় পাশে থাকে।

তোমার ত' আরতি আছে।

কুশল চোখ তুলে ঠোঁট বাঁকাল। বলল, আমার ঝুমুও আছে।

যা, দু'জন থাকতে নেই।

থাকলে কি হয়?

ঝগড়া হয়।

ও আমার কেউ না। তুমি কাছে না এলে কী করব।

কী করে যাই! দাদুটা দেখলে ত কেমন আগলে আগলে রাখে। কেবল ডাকে ঝুমু কোথায় রে। কাছে যাই কী করে। কাল আসছো। আমার ভীষণ লজ্জা করে।

আসলে বনভূমি এক, যেন কতকাল ধরে বাস করে আসছে শ্বাপদেরা, বিচরণের সময় পাতায় পাতায় পাওয়া যায় খস খস শব্দ। তার মরণ নাই, ঝুমুর মধ্যে সেই মরণ নাই শব্দ হামেশা হিজিবিজি আকার নিচ্ছে। গোপনে সে যুবকদের নিয়ে খেলা করতে ভালবাসে। আশ্চর্য লাবণ্যময়ী সে। ঘাড়ে চুল মসৃণ, যেন একরাশ চিমনির ধোঁয়া, সে দু' হাতে সাপটে ধরে চুল। নৃত্যভঙ্গিমায় এক অহমিকা কাজ করে নিয়ত।

বড় সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে আজ কুশল। গাছপালার মধ্যে এই জ্যোৎস্নায় ঘুরে বেড়ানো কি আরাম। তুমি আজ থেকে গেলে না কেন। অমলটা জানি কেমন! কথা বলে না। খুব অহংকারী বুঝি! জান অহংকারী যুবক দেখলেই আমার হাসি পায়। আসলে মনে মনে অমল সব কিছু উপভোগ করে। এই যেমন ধরু আমি, কথা কম বলি, সুন্দর যুবা দেখলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করি—মনে হবে কি মেয়ে রে বাবা, লাজুক, আনসোস্যাল। বাস্তবিক কিন্তু আমি উল্টো কোন সুন্দর যুবক দেখলেই আমার শরীরে কি যে হয়! বড় সংগোপনে যাকে লালন করছি, তা যেন খোলামেলা হয়ে যাবে। লজ্জা করে! বেশি উচ্চকিত হলেই টের পাবে, ভেতরে আমার আশ্চর্য মনোরম এক বাজনা বাজছে। আমি স্থির থাকতে পারছি

না। যেন ধরা পড়ে যাব। ধরা পড়ে গেলে মেয়েদের সম্ভ্রম বলতে কিছু থাকে না।

এমনি সব হিজিবিজি চিন্তা এসে ঝুনুর মাথায় কুট কামড় বসায়। খোলা আয়নায় নিজেকে দেখলে, কেমন নেড়া তালগাছ কিংবা বড় ফাঁকা মাঠ মনে হয় সামনে, যেন শেষ নেই। যেন পথ হারিয়ে ফেলেছে। এক যুবক তখন সামনে হাঁটে, পথ দেখায়। সারা বেলা যেন তারই প্রতীক্ষায় ঝুনু আজকাল পৃথিবীতে বড় হয়ে উঠছে। পৃথিবীর গাছপালা পাখি প্রকৃতি সবাই ঝুনুর এই বড় হওয়া যেন বড় বড় চোখে দেখছে। ঝুনু হাঁটতে গেলে টের পায়, চুপচাপ ব্যালকনিতে বসে থাকলে টের পায়, ট্রেনে চড়ে যাবার সময় টের পায়। সে লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতে পারে না। সবাই যদি ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে থাকে কার না লজ্জা লাগে। কেবল এই স্নানের ঘরটায় সে চোখ তুলে ভাল করে সবকিছু দেখতে পারে। সবই সে যখন নিপুণ মনোযোগ দিয়ে উপভোগ করছিল তখনই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ ঠক্ ঠক্। ঝুনু শিগ্‌গির বের হয়ে আয়। তোর দাদু কেমন করছে।

দাদু! কেমন আর্তনাদ করে উঠতে গিয়ে টের পেল সে উলঙ্গ হয়েই দরজা খুলে ছুটছে। তাড়াতাড়ি তোয়ালেটা সারা গায়ে জড়িয়ে বের হয়ে এল। বাবা ছুটে ওপরে উঠে আসছে। সে বোবার মতো দাঁড়িয়েছিল। এই অবস্থায় যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক না তা বুঝতে পারছে না। দাদু আজ ঘেরিতে গিয়েছিল পাখি শিকারে। দাদুর মেজাজ ক'দিন থেকেই ভাল না। স্টেশনের বড়-বাবু দেখা করে না যাওয়ায় সবাই টের পেয়েছিল, দাদুর সম্ভ্রমবোধে লেগেছে। প্রভাব-প্রতিপত্তি তুঙ্গে উঠে গেলে যা হয়। নৌকায় ফেরার সময় দেখেছে চুপচাপ বসে আছেন দাদু। কুশল অজগর সাপ দেখেছে বলার পর থেকেই দাদু ক্ষেপেও ছিল। বেয়াদপ ছোক্‌রা। বদমাস ছোক্‌রা। এমন চোখ-মুখ করে তাকিয়েছিল দাদু কুশলের

দিকে। মুখে কোন রা ছিল না। রক্ত চাপ বেড়ে গেলে মানুষের পক্ষে বড় ভয়ের।

তখনই মা'র ধমক, এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? শিগ্‌গির ভিতরে যাও। নিজের দিকে তাকাতেই তার সম্বিত ফিরে এল। ছুটে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার সময় ডাকল, মা মা।

ললিতা বলল, তাড়াতাড়ি কর। তোমার দাদু কেমন হয়ে গেছেন।

ঘরের ভিতর থেকেই ঝুনু বলল, কী হয়েছে?

ছাদে লাঠি বুকে নিয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছেন এবং তখনই শুনতে পেল, সিঁড়িতে ধুপধাপ শব্দ। মা বোধহয় সবাইকে খবরটা দিয়ে আবার ছুটে যাচ্ছে উপরে। সিঁড়িতে এখন অনেক মানুষের পায়ের শব্দ। কোনরকমে একটা ম্যাকসি গলিয়ে ঝুনুও ছুট লাগাল। ওপরে উঠতেই কে যেন বলল, শরৎ ডাক্তারকে ডাকুন। কেউ বলল, নীচে নিয়ে গেলে হয় না।

বাবা স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে আছে।

মা দাদুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

ঝুনু কাছে গিয়ে বলল, দাদু আমি।

দাদুর বুকের ওপর লাঠিটা তেমনি রাখা। দাদু দু' হাতে লাঠিটা বুকে চেপে রেখেছেন যেন। তিনি লাঠি সঙ্গে রাখতেন। কিন্তু লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতেন না। পাছে বুড়ো হয়ে যান, আকাশটা নাগালের মধ্যে চলে আসে, সেই ভয়ে দাদু কখনও লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতেন না। যখনই কেউ শ্রীনাথবাবুকে রাস্তায় দেখেছে, তখন দেখেছে একজন মানুষের দৃপ্তভঙ্গীতে হাঁটা। হাতের ওপর লাঠি। মাঝে মাঝে লাঠিটা হাওয়ায় দোলাচ্ছেন। সেই মানুষ লাঠি বুকে নিয়ে উদাস চোখে তাকিয়ে আছেন, দূরবর্তী কোন গ্রহের দিকে যেন। দাদু কখনও এমন লাঠি নির্ভর হয়ে যাবে ঝুনু যেন ভাবতেই পারে নি। ঝুনু কেন, বাড়ির কেউ না। সব সময় তিনি থাকবেন, বসবাস করবেন

এমনই যেন কথা ছিল। ঝুনু আবার বলল, দাদু আমি ঝুনু। দাদু আমাকে চিনতে পারছ না?

দাদু কেমন এই প্রথম সহজভাবে তাকালেন। বললেন, চিনতে পারব না কেন? তুমি ঝুনু না। তোমার মা বাবা ঐ ত' দাঁড়িয়ে আছে।

তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে?

ধীরেন এমন কথায় সহজেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারল। দলিল দস্তাবেজগুলো এখনও সব ঠিকঠাক হয় নি। হুট করে মরে গেলে চলবে কেন। চারপাশের সবাইকে ধীরেন একটু দূরে সরে দাঁড়াতে বলল। হাওয়া আসুক। সে সাহস পেয়ে এবার মুখের কাছে নুয়ে বলল, ধরব? নীচে চলুন।

ধরবে কেন?

ললিতা বলতে পারল না, এই কিছুক্ষণ আগে তার শ্বশুর লাঠি বুকে নিয়ে প্রায় একজন অচৈতন্য মানুষের মতো পড়েছিল। স্থির চোখ। যে মানুষ জীবনে লাঠি সম্বল করে বাঁচতে চান নি, সেই মানুষ লাঠিটা প্রায় পুত্রবৎ বুকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। স্থির স্তব্ধ। কোন রা নেই। কার না ভয় হয়। ললিতা এসেছিল, শ্বশুরের খোঁজে। রাতে তিনি স্বল্প দুধরুটি খান। তিনি আজকাল খেতে বেশি রাত করেন না। সকাল সকাল খেয়ে নিজের বিশাল ঘরটায় ঢুকে কিছুক্ষণ রেডিও শোনেন। তারপর ললিতা জানে, কোন এক পাপবোধ মানুষটার মধ্যে কাজ করে। শ্বাশুড়ী ঠাকরুনের ছবিটার নীচে কিছুক্ষণ মাথা নত করে দাঁড়ান। চাকর বাকরের কাজ পছন্দ নয় বলে, ললিতাকে একগ্লাস জল, হজমের বড়ি সব এক এক করে দিয়ে যেতে হয়। ঠাণ্ডা গরমে ক'দিন খুব কেশেছিলেন। তার সিরাপ দিতে হয়। এইসব কাজ সেরে ফেলার জন্যই শ্বশুরের খোঁজ করতে গিয়ে দেখে, মানুষটা বৈঠকখানায় নেই। বাড়িটার চারপাশে ঘুরে বেড়ান তিনি জ্যোৎস্না রাতে, টুনে এসে বলল, নেই এবং টুনে দেখে

এসেছে তখন রুনু ঘাটলায় বসে হাওয়া খাচ্ছে। সেও কোন দাদুর খবর দিতে পারে নি। স্টেশনে যেতে পারে। না সেখানেও না। অগত্যা তিনি যেখানে বছর চার-পাঁচ একেবারে আর ওঠেন না, সেই ছাদে তাকে আবিষ্কার করা গেল। ছাদে চিৎপাত হয়ে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে। বুকে তাঁর ইদানীংকার সঙ্গী কিংবা সহকারী সেই লাঠিটা। যেটা এই বংশের শুভ্র প্রতীক, যেটা কোন এক সন্ন্যাসী চন্দ্রনাথ থেকে ফেরার পথে তাঁকে দিয়ে বলেছিল, দরকারে কাজে লাগাস। আজ কি সহসা লাঠিটা যে বড়ই দরকারী শ্রীনাথবাবু তা টের পেয়েছেন! এই বাড়িঘর, গাছপালা, পুকুর মাঠ, হিজলের বিল, ইস্টিশনের চেয়েও দরকারী। তা না হলে এমন বুকে চেপে ধরে কেউ লাঠিটা!

ধীরেন বলল, কেমন লাগছে?

ভাল।

চলুন নীচে! ধরছি।

ধরতে হবে না। তারপরেই ওঠার চেষ্টা করতে গেলে ধীরেন ধরতে গেল।

আঃ, বলছি ধরতে হবে না।

লাঠিটা দিন।

না। যেন শেষ দরকারী জিনিষটিও তাঁর একমাত্র পুত্র হরণ করে নেবে। বয়স বাড়তে বাড়তে তিনি কি বুঝতে পারছেন, এই সংসার তাঁর সব কিছু হরণ করে নিয়েছে। তিনি এখন সবুজ বনে মৃত বৃক্ষ। শ্রীনাথবাবু লাঠিটায় ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। শেষ সঙ্গী। ক' বছর থেকে হাতে আছে। কোথাও বের হলেই হাঁক, টুনে আমার লাঠি। লাঠি নিতেন বটে, তবে বগলদাবা করে হাঁটতেন। মাটিতে কখনও ভর দিয়ে হাঁটতেন না। আসলে লাঠিটা তাঁর প্রতিপক্ষ, ব্যঙ্গ করে বলছে আর কতদিন, বয়স হলেই দরকারে লাগে। দেখি আমাকে সম্বল না করে কতদিন বেঁচে থাকতে পার। এবং আজ তাঁর

মনে হয়েছে—কারণ তিনি ষ্টেশন থেকে ফিরেই ছাদে উঠে গেছিলেন। বেশ দ্রুতগতিতে। ষ্টেশনে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা। বাড়ি আসতে না পারায় লজ্জিত। বিরাট এক দায়িত্বের কথাও বলল, ষ্টেশনের বড়বাবু। যার জন্য তাঁর এই বাড়িঘর এবং বিশাল সাম্রাজ্য, সব অর্থহীন হয়ে গেছে খবরটা শোনার পর। একটা ষ্টেশনই জেনেছিলেন, মানুষের জন্য থাকে। কিন্তু খবরটা পাবার পর মনে হয়েছে, মানুষের জন্য থাকে অনেক ষ্টেশন। সে গাড়ি করে ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পার হয়ে যায়।

শ্রীনাথবাবু লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে বেশ জোরে হাসার চেষ্টা করলেন, তোমরা দেখছি সবাই ভয় পেয়ে গেছ। ভয়ের কিছু নেই। এই কিছুক্ষণ আগে মাথার আকাশটা হাত দুই উপরে নেমে এসেছিল, লাঠি দিয়ে তা ছুঁতে গেলাম। পারলাম না। এক আঙ্গুলের ফাঁক। গোড়ালি তুলে ছুঁতে গেলাম, তখনও দেখছি, এক আঙ্গুলের ফাঁক। দুটো ইটের উপর উঠে ছুঁতে গেছি, তখনও দেখি এক আঙ্গুলের ফাঁক।

এমন অদ্ভুত কথা শুনে সবাই থ'। আসলে বুড়ো হলে এই হয়। আকাশ অনেক নীচে নেমে আসে। বিস্তীর্ণ পৃথিবীর সব সুখসম্পদ ভোগ থেকে বিচ্যুত হয়। সব কিছুই মনে হয় অন্য এক জীবনের কথা। অথবা মনে হয় এই গ্রহ তার জন্য আর কোন অপেক্ষায় থাকবে না। দূরবর্তী এক গ্রহের প্রবল আকর্ষণ তাকে ভয় পাইয়ে দেয়। ফলে আকাশকে ভেঙ্গে তছনছ করার এক অতীব স্পৃহা জন্মে। তিনি হয়ত লাঠিতে খোঁচা দিয়ে আকাশ ফুটো করার মতলবে ছিলেন। পারলেন না বলে হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন। তখন শ্রীনাথবাবু নিজেই যেন সবাইকে মনে করিয়ে দিলেন, এখানে দাঁড়িয়ে কেন। চল নীচে যাই।

চরাচরে মহিমান্বিত জ্যোৎস্না। গঙ্গার পাড় ভেঙ্গে কাছে চলে আসছে বাড়িটার। কত আয়াসে এই বাড়িঘর, জোত জমি, পুকুর, বাগান—সবই কেউ গ্রাস করবে বলে অপেক্ষায় আছে। যেন দু

দিনের বেড়ে ওঠা, বড় হওয়া সবই প্রকৃতির কূট খেলা। নাচিয়ে দিয়ে মজা দেখে। শ্রীনাথবাবু দূরে সেই প্রকৃতির অট্টহাসি শুনতে পান। যখন বাড়িঘর নির্মাণ করেন, প্রকৃতি মুচকি হাসছে। যখন মাধবীলতাকে পাল্কী থেকে নামিয়ে ঝলমলে বেনারসীতে এই গৃহে প্রবেশ করান, প্রকৃতি মুচকি হাসে। তারপর সংসার, মাধবীলতার ছোট বোন, মাধুরী-লতার সঙ্গে অবৈধ প্রেম—কত কি, প্রকৃতি মুচকি হাসে। ঘেরি তৈরীর সময় সাঁওতাল কুলিদের হল্লা, হিজলে ঘেরি করে শস্য ফলানোর চেষ্টা এবং সফল হওয়া, বান-বন্যার রুদ্ররোষের প্রতি কটাক্ষ হেনে যখন সফল মানুষ তখনও প্রকৃতি মুচকি হাসে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সেই হাসি ক্রমে আজ এক অতীব কঠিন অট্টহাসি হয়ে দেখা দিল। আজই প্রথম লাঠিতে ভর দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকলেন। সন্ন্যাসীর সেই কথা যেন কতদিন পর কতকাল পর কাজে লাগছে। দরকারে কাজে লাগাস। এই লাঠিটাই প্রকৃতির সেই অট্টহাসি থেকে পরিত্রাণ পাবার তাঁর অমোঘ ওষুধ। তাকে প্রায় সাপটে ধরলেন। বললেন, খবর পেয়েছ, স্টেশনটা এখান থেকে সরে যাবে।

ধীরেন বলল, সরকারের ইচ্ছে তাই। তবে আমরা বাধা দেব।

শ্রীনাথবাবু জানেন, ধীরেন নেতা মানুষ এ-অঞ্চলের। শহর থেকে সে-ই একটা পাকা সড়ক এই গাঁয়ের ওপর দিয়ে সালার পর্যন্ত নিয়ে গেছে। এখানে একটি সরকারী হেল্‌থ সেন্টার তার চেষ্টাতেই হয়েছে। সে ইচ্ছা করলে জনগণের মধ্যে বিক্ষোভের বীজ ছড়িয়ে দিয়ে একটা বিহিত করতে পারে। তিনি লাঠিটা দেড় হাতে তুলে হাওয়ায় ঘোরাবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। জগদ্দলের মতো ভারি মনে হচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শরৎ ডাক্তারের সাইকেলের ঘন্টি শোনা গেল। শ্রীনাথবাবু খাটে বসেই বললেন, এল যেন ধন্বন্তরি। এটাও কটাক্ষ। বলার ইচ্ছে শরীরের নাম মহাশয়—তোমার ওষুধের গুণ নাই হে। এই শরীর তাকে রক্ষা না করলে সাধ্য কি ওষুধে রক্ষা করে।

শরৎ ডাক্তার শ্রীনাথবাবুকে দেখে বিস্মিত হল। খুবই সুস্থ মানুষ। আর দশজনের মতো বসে গল্পগুজব করছেন। অথচ জরুরী কলে সে ছুটে এসেছে। মনে হয়েছিল হাত-পা ঠাণ্ডা, চক্ষুস্থির যখন, তখন ঘণ্টা বেজে গেছে। যাই হোক শরৎ ডাক্তার শ্রীনাথবাবুর প্রেসার দেখল মনোযোগ দিয়ে। নাড়ি দেখল। সবই স্বাভাবিক। বুকটা দেখতে হয়। উল্টে পাল্টে তাও দেখল। তারপরই প্রশ্ন—দুপুরে কি খেয়েছিলেন?

যা খাই।

পেটটা দেখি। বলেই জামা তুলে হাত চালিয়ে দিল শরৎ ডাক্তার। টিপে টিপে দেখল। টোকা মেরে দেখল। না, স্বাভাবিক। আবার প্রশ্ন—ঘেরিতে পাখি শিকার করতে গেছিলেন?

তাতে কি হয়েছে। রোগের লক্ষণ ধরার আর কোন ফিকির খুঁজে পেলে না।

শরৎ ডাক্তার বোঝে মানুষটা দাম্ভিক। কিছুটা স্বেচ্ছাচারী। অঞ্চলের জমিদার মৃগাঙ্কশেখর এবং শ্রীনাথবাবুর সঙ্গে সেই কবে থেকে অদৃশ্য একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে আসছে। দেখলে বোঝা যাবে না, অথচ সবাই জানে শ্রীনাথবাবুর কথার ওপরে কথা নেই। মৃগাঙ্ক-শেখরের কোন প্রশংসা তাঁকে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। যারা চালাক মানুষ শ্রীনাথবাবুর এই দুর্বলতার সুযোগে এটা ওটা সহজেই হাতিয়ে নিতে পারে। শুধু বললেই হল, মৃগাঙ্কশেখরের বিশাল পাঁচিলের গায়ে আর একটা বটগাছ গজিয়েছে। এবং জমিদারী চলে যাবার পর মৃগাঙ্ক-শেখরের যখন ঠাঁট সত্যি কমে এসেছিল, এই মানুষটিই তখন আবার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বলেছে, ট্যাপা, তুই বরং দেবোত্তর সম্পত্তিটা বিক্রি না করে বাঁধা রাখ আমার কাছে। দলিল করতে হবে না। টাকাটা সুযোগমতো ফেরত দিস।

শরৎ ডাক্তার হেলথ সেন্টারে এসে এ-সব শুনেছে। এবং যা কিছু ঠাঁট এখনও আছে মৃগাঙ্কশেখরের সবটাই এখন বলতে গেলে শ্রীনাথ-

বাবুর কৃপায়। অবশ্য কুভাবের লোক কু-কথা বলে। যখন শ্রীনাথ-বাবু ঠিকাদারি নিয়ে রেল লাইন তৈরী করতে এ-অঞ্চলে আসেন, তখন মৃগাঙ্কশেখরের বাবা গিরীন্দ্রশেখর দোর্দণ্ড প্রতাপশালী জমিদার। গঙ্গার পাড়ে চক-মেলানো বাড়ি। বালির চরে বিকেলে কালো ঘোড়ায় উঠে আসে মৃগাঙ্কশেখর। গবাক্ষ পথে এক যুবতী তাকিয়ে থাকে। সম্পর্কে মৃগাঙ্কশেখরের মামাতো বোন। শ্রীনাথবাবু নাট মন্দিরের সামনে চোখ তুলে তাকাতেই সেই নারীকে দেখেছিলেন। নারীর নাম মাধবীলতা। ছায়া ছায়া হয়ে পাশে আর কেউ। শ্রীনাথ-বাবুর সেই যে ঘোড়ায় চড়ে সংযুক্তা হরণ করে নেবার প্রলোভন জাগল তারপর আর থামা নেই। মাধবীলতাকে পাবার জন্য এই স্টেশন সংলগ্ন এক বিরাট উদ্যানবাটী নির্মাণ করলেন। গিরীন্দ্রশেখর যত খবর পান, তত লাঠি ঠোকেন। তারপর খবর যায় শ্রীনাথবাবু মাধবীলতার পাণি প্রার্থী। মাধবীলতার বোন মাধুরীলতাকে তখনও তার দেখার সৌভাগ্য হয়নি। বিয়ের পর শ্রীনাথবাবু টের পেলেন, মৃগাঙ্কের সঙ্গে মাধুবীলতার অবৈধ প্রেম দীর্ঘদিনের। অথচ ঐ যে বলে না, স্বেচ্ছা-চারী মানুষের মর্যাদা বড় বেশি প্রিয়। কু-ভাবের লোকেরা তাই বলে থাকে মচকাবে তবু ভাঙবে না। শ্রীনাথবাবু মাধবীলতাকে ঘুণাক্ষরেও টের পেতে দিলেন না, মৃগাঙ্কর সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্কের খবর তিনি জানেন। মাধবীলতাকে তিনি বলতেন, বড়বৌ, তোমার হীরের নাক ছাবি খুলে ফেল। বড় দ্যুতি। চোখ ঝলসে যায়। বড় বৌ নাকি ট্যারচা করে তাকাত। সেই গভীর চোখের কটাক্ষে শ্রীনাথবাবু পর্যন্ত অস্থির হয়ে উঠতেন। মাধবীলতার মৃত্যু নিয়ে অঞ্চলের প্রবীণ মানুষেরা সংশয় প্রকাশ করে থাকে। আত্মহত্যা, না হত্যা তার প্রমাণ শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। মৃগাঙ্ক অনেকদিন এ-বাড়ি যাওয়া আসা তারপর থেকে বন্ধ রেখেছিল। কিন্তু এটা শ্রীনাথবাবুর কাছেই অসহ্য ঠেকেছে। একমাত্র ঘর যার সঙ্গে তিনি ঠোকাঠুকি করে ঘোরদৌড়ের মাঠে বাজিজেতার জন্য নেমেছেন, এখন সেও যদি দশজন গরীব গরবার

মতো হয়ে যায় তবে কার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এটা থাকলেই তার মনে হয়, তিনি ঠিকঠাক বেঁচে আছেন। না থাকলে মনে হয় ঠিকঠাক বেঁচে নেই। জীবনে একজন প্রতিপক্ষ বড় দরকার। সামনে একটা ডামির মতো রেখেছেন মৃগাঙ্কশেখরের জীবন। তাকে নিয়েই তিনি আজ ঘেরিতে পাখি শিকার করতে গেছিলেন।

শরৎ ডাক্তার বলল, ট্যাপাবাবুর শ্যালক এয়েছে শোনলাম। সেও নাকি সঙ্গে গেছিল।

ট্যাপা অর্থাৎ মৃগাঙ্কশেখর, শালক অর্থাৎ অধীর চক্রবর্তী, সঙ্গে দুই মেয়ে আরতি-নমিতা, সঙ্গে তাদের দুই বন্ধু কুশল-অমল—সব মিলে শিকারে যাওয়া একটা গ্রাম জায়গায় নানা কারণে খবর হয়ে যায়। অমন সুন্দর গঠনের মানব-মানবী সাধারণত গাঁয়ে থাকে না। পোশাকের জলুস অতীব। আর যদি কোন জলুসওয়ালা মানুষ এই স্টেশনে নামে, সবাই ভেবে নেয় হয় মৃগাঙ্কশেখরের বাড়িতে, না হয় শ্রীনাথবাবুর আত্মীয়স্বজন। এমন চমকে দেওয়া মানুষ এই স্টেশনে নামলে জনসাধারণ তাই ভেবে থাকে। সুতরাং জনসাধারণ, অর্থাৎ যারা সাধারণ গেরস্ত মানুষ, দশ-পাঁচ বিঘে জমি আছে, পুকুর আছে, কিংবা বাউরি বাগ্দিরা গদগদ হয়ে যায় তাদের দেখতে দেখতে। শরৎ ডাক্তার হেলথ সেণ্টারে বছর তিনেক আছে, ওর বাসায়ও কখনও কখনও চমকে দেওয়া মানুষ আসে। বিরাট হিজলের বিল ঘেষে রেল লাইন, লাইনের গায়ে যেসব গ্রাম তার বাসিন্দারা বড়ই গরীব। সুতরাং এহেন জায়গায় শ্রীনাথবাবু নিজের গরজেই মৃগাঙ্কশেখরকে প্রতিপক্ষ দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। কারণ, প্রতিপক্ষ না থাকলে সংসারে বেঁচে সুখ থাকে না।

খবর পেয়ে মৃগাঙ্কশেখরও সাইকেলে চলে এসেছে। অধীর চক্রবর্তী আসেনি। মেয়েদের নিয়ে গঙ্গায় নৌকা বিহারে গেছে। ইলিশের নৌকা থেকে ইচ্ছে আছে পেলে দু একটি তাজা ইলিশ কিনবে।

মৃগাঙ্ক এসে এমন খবর দিলে, শ্রীনাথবাবু বললেন, তোমার বাড়িতে পাখির মাংস হয়নি।

হচ্ছে।

তবে মাংসের ঘ্রাণ ফেলে গঙ্গা বিহারে গেলে।

খুব নাকি রোমান্টিক জায়গা।

বেশত। তাহলে পাখি কটা নৌকায় তুলে নিলেই পারত। আহার এবং ভ্রমণ একসঙ্গে নৌকায়। তারপরই শ্রীনাথবাবু তাকিয়ায় ঠেস দিলেন, কিছুক্ষণ আগে তাকে নিয়ে বাড়িতে বিভ্রাট গেছে দেখলে কে বুঝবে। যেন, সব ফাঁকা হয়ে গেলেই বলবেন, খেলবে নাকি, আজ আমার বড় শুভদিন।

শরৎ ডাক্তার বলল, সকাল সকাল শুয়ে পড়বেন। বাড়িঘরের চিন্তা এখন একটু কমান।

শ্রীনাথবাবুর চুল সব সাদা, রোজ এখনও সকালে দাড়ি কামান। লম্বা সাদা গোফ এবং পেশীতে শক্তি আছে দেখলে টের পাওয়া যায়। ভাল ঘুম, ভাল আহার দুটোই এখন তাঁর সম্বল। যদিও শরীর রক্ষার্থে রাতের আহার একেবারেই কমিয়ে দিয়েছেন। তবে দুপুরে তিনি আহারে কোন কার্পণ্য রাখেন না।

শরৎ ডাক্তার বলল, ঘেরিতে নাকি আবার একটা অজগর দেখা গেছে।

শ্রীনাথবাবুর মুখটা সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেল।

এই এক উপদ্রব! কার গরু বাছুর না খায় আবার।

ধীরেন ঘরে নেই। সেই বৈঠকখানায় তার টি আর ঠিক হচ্ছে। টিপ ছাপ মেলান হচ্ছে। হিসাবপত্র। খুব নিজের দুজন মানুষ, যারা তার তাবে থাকতে পছন্দ করে এবং সময়ে অসময়ে সে যাদের কিছু পাইয়ে দেয়, তেমন সব লোকজন তার ঘরে এখন। ঝুনু স্নান সেরে রেডিওতে বিবিধ-ভারতী শুনছে। কাঠের কুশনে এলানো শরীর। ললিতা আলাদা গামলায় পাখা চালিয়ে রান্না মাংস ঠাণ্ডা

করছে। ফ্রিজে তোলার আগে সব সে ঠাণ্ডা করে তোলে। কেবল ধীরেনের জন্য এক বাটি এবং দুই মেয়ের জন্য ছোট দু বাটি রেখে সবটাই গুদাম জাত করে রাখতে ব্যস্ত। রুনু তখন ঘাটলায়। সামনে বসে গোলাম আহার করছে। বড় বড় গ্রাসে খাচ্ছে। ওর শক্ত মজবুত শরীর এবং উরুতে জলকণা, স্নান সেরে সে কোন রকমে গা মুছে রুনু দিদিমণির জন্য তাড়াতাড়ি খেতে বসে গেছে। রুনু দিদিমণি তার খাওয়া দেখতে বড় আরাম পায়। সেটা কি আরাম, কোন রকমের আরাম জানে না। সে অবশ্য একটি আরামের খবর রাখে, ভাবতেই ভারি লজ্জা লাগছিল। মনের মধ্যে এমন কু-কথা টের পেলে রুনু দিদিমণি রাগ করতে পারে। খেতে খেতেই চোখ তুলে দেখল— রুনু দিদিমণি পা চুলকাচ্ছে। ম্যাকসির কিছুটা তুলে পায়ে মশা বসেছে বলে চুলকাচ্ছে। গোলাম ও-সব দেখলে কেমন মস্তিষ্ক স্থির রাখতে পারে না। ফলে সে খাবারের প্রতি আরও বেশী লোভী হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। ওর দুই কাঁধ কত বিশাল, এ-সময় সেটা বোধ হয় রুনু স্পষ্ট দেখতে পায়।

শরৎ ডাক্তার ফের বলল, বড়বাবু আপনি দেখেছেন?

শ্রীনাথবাবু বললেন, না।

কে দেখল তবে?

কুশল দেখেছে।

শহর থেকে এসে এখানে প্রথমেই অজগর সাপ দেখে ফেলল। ঢ্যামনা, চিতি, বোড়া হলেও না হয় কথা ছিল।

কী রে আরো খাবি।

গোলাম মুখ তুলে তাকাল। ওর জীবনেও কেন জানি পেট ভরে না। যাই খাক, যতই খাক কিছুক্ষণ পর মনে হয় সব ফাঁকা। এত খিদে পেলে খেতে দেবে কে। এ তল্লাটে তাকে কেউ খেতে দিয়ে রাখতে রাজি না। আর তার খোরাকি দেবার ক্ষমতা একমাত্র এ বাড়ির মালিকদেরই আছে। টাকা পয়সা নিয়ে সে কখনও গজ গজ করে না। গজ গজ করার স্বভাবও তার নেই। সে পেট ভরে খেতে না পেলে উন্মাদ হয়ে যায়। তবু তার কারো উপর রাগ নেই। আগে হাজিদের ঘেরিতে গরু বাছুর তাড়াবার কাজ করত। তার আহার বেশি বলে তাড়িয়ে দিয়েছে। তখন সে এক বটতলার মানুষ। চুরি চামারি, হাঁস মুরগী চুরি, জঙ্গলে বসে পুড়িয়ে খাওয়া এইভাবে দিন যায়। মাঝে মধ্যে প্রহার খায় লোকজনদের হাতে। সে খাবার দোকানের সামনে বসে থাকলে দেখতে পায় কাচের ভিতর থেকে জিলিপি সিঙ্গাড়া সব তার দিকে তাকিয়ে আছে এবং বেশিক্ষণ এভাবে দু'জনের চাওয়া চায়িতে তার মাথা ঠিক থাকে না। সে কাচের বাক্সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। কনক কুণ্ডদের দোকানে কাচের বাক্স ভেঙ্গে একবার লুঠপাট করে সব খেয়ে ফেলেছিল। মার ধোর, চেঁচামেচি, কনক কুণ্ড বাটখারা দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিল, চারপাশে মানুষের হল্লা, সে-সব খেয়ালই ছিল না। সে দু হাতে গব গব করে সব খাচ্ছিল। লোকে টেনে-হিচড়ে নিতে চাইছে, কিন্তু কেউ নড়াতে পারছে না। বাজার হাটে ছাড়া গাই গরুর মতো স্বভাব তার। বাটখারার বাড়িতে মাথা ফেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে। ভ্রূক্ষেপ নেই। রক্তে মাখামাখি খাবার সে দু'হাতে গোগ্রাসে গিলছিল। কে মারছে, কোথায় মারছে, কার নাকে মাথায় রক্ত কোন হুশ নেই।

কনক রুজের দোকান ইষ্টিশনের লাগোয়া। রুনুর আরও তখন ছোট বয়েস। ফ্রক পরে। সারাদিন লাফিয়ে বেড়ায়। কখনও ছড়া কাটে। সে দাদুর ফুলের বাগান থেকে চিল্লাচিল্লি শুনতে পেয়েছিল। এই ইষ্টিশনে এমন সরগোল সে কখনও শোনেনি। প্রায় যেন আগুন লেগেছে। যে-যেভাবে পারছে ছুটছে। কনক রুজের মিষ্টির দোকানের কাচ ভেঙ্গে গোলাম হুমড়ি খেয়ে পড়েছে নাকি। তার আগে কেউ এদিকটায় তাকে দেখেনি। দেখলেই গেরস্ত মেয়ে-বৌরা ভয় পায়। ঘুরে ঘুরে সকালেই নাকি সেদিন, অশ্বত্থতলায় চুপচাপ বসেছিল। কেউ কিছু বললে বলেছে, দেশে গাঁয়ে ফিরে এলাম। তারপর কনক রুজের দোকানে ক'বালতি জল এনে দিয়েছে। দোকানে জল দিতে গিয়েই গরম জিলিপির গন্ধে মাথা খারাপ হয়ে গেছিল। সে তখন কাণ্ড বাধিয়ে বসে।

রুনু ছুটে গিয়ে দৃশ্যটা দেখেই হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিয়েছিল। গোলাম এক না-বালক না-তরুণ না-যুবক বোঝা যায় না। কেবল রুনুর বয়স কম ছিল বলে ধরতে পেরেছে, বড় ক্ষুধার্ত। ক্ষুধার্ত মানুষকে কেউ এ-ভাবে মাথা ফাটিয়ে দেয়! মানুষ না খেতে পেলে কি কষ্ট রুনু টের পেয়েই কেঁদে ফেলেছিল। আর তখনই হুঁশ ফিরে আসে সবার। সত্যিই গোলাম মানুষের বাচ্চা। মানুষের বাচ্চার খিদে। মানুষের যাবতায় বিবেক তখন লোকজনের মাথায় গিজ গিজ করছিল। শ্রীনাথবাবুর হাতের লাঠি হাওয়ায় দুলছিল। নাতিনকে এ-ভাবে কাঁদতে দেখে তিনি বললেন, এখানে তুমি কেন! কারণ এই সব নিষ্ঠুর ঘটনায় রুনু কোন মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে। টুনেকে ডেকে বলেছিলেন, ওকে এখানে কে আসতে দিল।

রুনু চোখ মুছে বলেছিল, তোমরা ওকে মারছ কেন?

মারবে না। দেখেছিস কি কাণ্ড। মানুষ দিনদুপুরে ডাকাতি করে কখনও?

ডাকাতি করল কোথায়? ও তো খাচ্ছে। খিদে পেলে খাবে না?

সত্যিই খিদে পেলেই মানুষ খায়। গোলামের তবে খিদে পেয়েছে। খিদে বলে মানুষের আর একটা ইন্দ্রিয় আছে এই যেন প্রথম সবার মাথায় সেটা টোকা মারল। শ্রীনাথবাবু বলেছিলেন, এই ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। খিদে পেয়েছে যখন খাবেই। আর যা হবার হয়ে গেছে। কেউ গিলে ফেললে, সেটা বমি না হলে, যখন বের করার উপায় নেই, তখন ছেড়ে দে।

কনক রুজ বলেছিল, বড়কর্তা আমার সব খেয়ে নিয়েছে।

রুনু বলেছিল খাবেই ত'। তুমি ওকে কাজ করিয়ে খেতে দাও না কেন?

কনক রুজ বুঝল, এই বড়লোকের বেটি সব লক্ষ্য করে। ক'দিন আগে গোলাম তার দোকান ঘরের বেড়া বেঁধে দিয়ে গেছে। বাসি-পচা কিছু খাইয়ে ছেড়ে দিয়েছে। এখানে এসে কতদিন গোলাম খাবার লোভে কনক রুজের কাঠের পরাত, গামলা, বালতি, কড়াই মাথায় করে নিয়ে গেছে ইষ্টিশনের কলে। ধুয়ে-পাকলে একেবারে রূপোর মতো ঝকঝকে করে এনেছে। সে কোন কাজেই খুঁত রাখে না। কারণ আহার শব্দটি তার এই শ্রমের সঙ্গে যুক্ত। আহার এবং শ্রম দুটোতেই সে পটু। আহার এবং শ্রম দুটোই জীবনের সবচেয়ে দামী বস্তু। গোলামের খাওয়া এবং পরিশ্রম করার ক্ষমতা লক্ষ্য না করলে পৃথিবীতে সেটা বোঝা যায় না। অঞ্চলের গেরস্থ মানুষেরাও ভেবে ফেলেছে, তালগাছ নেড়া করতে হবে গোলাম, নারকেল পাড়তে হবে গোলাম, গাড়ির চাকা বসে গেছে, গোলাম—অসুরের মতো শক্তি লোকটার গায়—অথচ দু'চার পয়সা, কখনও পোয়াটেক চাল দিয়েই বিদায়। যেহেতু রুনু এই অঞ্চলের গাছপালার সঙ্গে বড় হয়েছে এবং গোলাম এই অঞ্চলের একজন মা-বাপ মরা ছেলে এবং এক চোখ বসন্তে গেছে, সর্দি ঝরে চোখটা দিয়ে সেজন্য আর একটা চোখের দিকে বড় সতর্ক দৃষ্টি রুনুর। সেখানে সে দেখতে পায় গোলামের মা ছিল,

বাবা ছিল। তার যেমন মা আছে বাবা আছে। গোলামের মা নেই বাবা নেই ভাবতে গেলেই কষ্ট। তার ওপর কনক রুজকে সব সময়ই মনে হয় তাঁর খারাপ মানুষ। সেই খারাপ মানুষের দোকান থেকে দুটো চারটি জিলিপি তুলে খেয়ে ফেলেছে বলে কি মার! মাথা ফেটে রক্ত। সে ভয়ে চোখ বুজে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল।

শ্রীনাথবাবু যখন দেখলেন কিছুতেই রুনু বাড়ি যাবে না, তখন বললেন কি চাই তোমার?

ওর মাথায় এত রক্ত কেন?

রুনুর কথাতেই মনে পড়ল, গোলাম কচ্ছপ অথবা মাছ নয়, রাস্তার কুকুরও নয়। তাড়াতাড়ি প্রভাবশালী মানুষ বলে তিনি বললেন আমার বাড়িতে নিয়ে আয়। গোলামকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তিন চারজন লোক। কারণ কনক রুজ থানায় চালান করবে বলে শাসাচ্ছে। পালিয়ে না যায়, সেজন্য কনক রুজের ক'জন বান্দা লোক শক্ত করে ধরে রেখেছে।

নাতিনের দুর্বলতা কেমন সংক্রামক ব্যাধির মতো শ্রীনাথবাবুকেও গ্রাস করল। বলল, তোরা ছেড়ে দে। আমি নিয়ে যাচ্ছি যখন, আমি বুঝব।

বড়কর্তা এটা একটা হার্মাদ। এক্ষুণি দৌড়ে পালাবে। আপনি জানেন না, কি দাগী আসামী হয়ে গেছে গোলাম।

পালায় পালাবে। সে আমি বুঝব। তারপর শ্রীনাথবাবু গোলামের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, চেয়ে নিলেই পারিস। না বলে পরের দ্রব্য নিলে চুরি করা হয়। এত অধর্ম করলে তোর ঠাঁই হবে কেন।

গোলাম কথা বলেনি।

কিরে বুঝতে পারছিস কি বলছি!

গোলামের কপাল বেয়ে তখন রক্ত পড়ছিল। হামলে খেয়েছে বলে মুখে হাতে আঠা এবং চটচটে ভাব। গায়ে হাত দিলেই আঠা লাগছে। কেউ সেজন্য আর কাছে ভিড়তে চাইছে না। গায়ে আঠা

আঠা কিছু লেগে থাকলে মনে হতেই পারে এঁটোলি পোকা সেটে আছে। সেজন্য গোলাম খুব এখন স্বাধীন। স্বাধীন বলেই সে কাউকে আর তোয়াক্কা করছে না। মাথায় শরীরে চিনচিনে ব্যথা। এটা মাঝে মাঝে মন্দ লাগে না। এক ধরনের সুখ সে অনুভব করে থাকে।

কেউ কেউ অবশ্য কনক রুজকে নিষ্ঠুর মানুষ বলছিল। মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, হাত-পা ফুলিয়ে দিয়েছে। মার তো একা কনক রুজ দেয়নি। সঙ্গে বান্দা লোকেরা পাইকারি মার মেরেছে। কেউ কেউ এ নিয়ে ঠাট্টা তামাসাও করছিল। দোকানের ভিড়টা পেছনে পেছনে যাচ্ছে। তবে বড়কর্তা সামনে ছিল বলে কেউ আর টুঁ শব্দটি করতে পারছে না। বাড়ি নিয়ে মাথায় ডেটল আর তুলোর একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন শ্রীনাথবাবু নিজেই। এবং গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন, উত্তাপ আছে। শ্রীনাথবাবু বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে আবার সেই প্রশ্নটাই করেছিলেন, কিরে বলে খেতে পারলি না। চাইলে কি কেউ না দেয়। বললেই পারতিস 'তিন চার দিন পেটে কিছু পড়েনি। ওখানে না পাস আমার কাছে আসতে পারতিস। কী মারটাই না খেলি। আহম্মক আর কাকে বলে।

গোলামের যা হয়, ভাষাজ্ঞান কম। খুব কথাও বলতে জানে না। হ্যাঁ—না কিংবা দুটো একটা শব্দ যা দিয়ে সে মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে। সবচেয়ে কঠিন শব্দ সে জানে সমোহন। সমোহন অর্থাৎ সম্মোহন। সে খাদ্যদ্রব্যের সম্মোহনে পড়ে যায় মাঝে মাঝে। শ্রীনাথ-বাবু বার বার পীড়াপীড়ি করলে এই কথাটাই বলল। বাবু আমার সমোহন আছে। ওটা চাগাড় দিলে পেটে কাঁকড়া বিছা হাঁটে। আমার কিছু ঠিকঠাক থাকে না। বাকিটা বললে যেন শোনাত, বড়কর্তা খাদ্যদ্রব্য দেখলে আমার ঘোর লেগে যায়।

বড়বাবু গায়ে হাত দিয়ে দেখেছিলেন, মারের চোটে গোলামের জ্বর এসে গেছে। তিনি এখান থেকেই ওকে ছেড়ে দিতে পারতেন। কিন্তু রুনুটার যে কি হয়েছে! সে চেয়ারে বসে আর পা দোলাচ্ছে

না। জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে। রুনু তো জানে না, সংসারে একটা বড় অজগর সাপ আছে। সে কেবল গ্রাস করার স্পৃহাতে শিথিল শরীর নিয়ে পড়ে থাকে। এমনিতে মনে হতে পারে, ওটা একটা বড় বুড়ো গাছের কাণ্ড কিংবা শেকড় বাকড়, নির্দোষ বস্তু কিন্তু নড়েচড়ে উঠলেই টের পাওয়া যায়। বড় কিম্ভূতকিমাকার এক জীবের বাস এই ইহসংসারে। না হলে বড় বউ এত থাকতেও কেন মৃগাঙ্কর জন্য জানালায় দাঁড়িয়ে থাকত। খাওয়াটাই সব নয়। খাওয়ার পরও থাকে কত লীলা। গোলাম সে-সব টেরই করতে পারেনি। তার কাছে খাওয়ার চেয়ে পৃথিবীতে বড় কিছু নেই। এবং কি ভেবে মনে হয়েছিল তার যখন গোলাম জীবনে এর চেয়ে বেশি কিছু বোঝে না, তখন এই বাড়ির গাছপালা, জমি গরু-বছুর এবং মায় বাড়ির চৌহদ্দির সব কিছু তদারক করতে পারে। কারণ শ্রীনাথবাবু বুঝেছিলেন গোলাম পেটভরে খেতে পেলে, কেউ এ-বাড়ির কুটো গাছটি নাড়াতে পারবে না। বাড়িটার একজন উপযুক্ত রক্ষক ভেবেই গোলামকে বলেছিলেন, আর কোথাও যাস না। তোর একটাই দোষ। কেবল খেতে চাস। খেতে চাইলেই পাবি কোথায়। কি আকাল চলছে জানিস না। গরমেণ্ট পর্যন্ত ধার দেনা করতে শুরু করেছে।

রুনু তখনও জানলায় তাকিয়েছিল। বৈঠকখানার ভেতর গোলাম মাথা গোঁজ করে বসে আছে। মাথায় ব্যাণ্ডেজ। হাতে পায়ে কাটা ছেঁড়ার দাগ। ভিড়ের লোকগুলি জানালা দিয়ে উঁকি মারছে। শ্রীনাথবাবু বলছেন, তোমরা যাও। এখানে কোন তামাসা নেই। যাও বলছি। কেউ কেউ চলে গেছে। তবু দু'একজন গ্রাম্য প্রবীণ শ্রীনাথবাবুর এই উদারতাকে পছন্দ করছিল না। কখন কি হবে বলা যায় না। যম ঘরে রেখে কে কবে রোগের সঙ্গে লড়াই করে। তবে এই যা, এরা কেউ শ্রীনাথবাবুর মুখের ওপর কথা বলতে পারে না। শ্রীনাথবাবু যা বলবেন, তাতেই ঘাড় কাত। চোর-ছ্যাচোড় তবু ভাল কিন্তু ঘাড় কাত করে দিলে আরও বড় গোলাম মনে হয়। তিনি

বিরক্ত হয়ে সেদিন সবাইকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে গোলামকে চুপি চুপি বলেছিলেন, একবেলা পেটভরে খেতে পাবি। আর কিছু না। তোর বাপের দু'কাঠা জমি আছে। তোর চাচা দখল করে আছে। ওটা তোকে যাতে দিয়ে দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সারাদিন থাকবি খাবি বাড়ি পাহারা দিবি। দরকার হলে, ঘেরিতেও থাকতে হবে। এইসব কড়ারে যখন শ্রীনাথবাবু গোলামকে রাখার ব্যবস্থা করছিলেন, তখনই রুনুর মুখে হাসি খেলে গিয়েছিল। বলেছিল এই গোলাম থাকবি ত'। না আবার চলে যাবি।

শ্রীনাথবাবু সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, ফেরার হলে এবারে নির্ঘাত হাজতে ঢুকিয়ে দেব। তোর বাবা চিনত, তোর নানাও চিনত। আমি লোটা কম্বল নিয়ে এসেছিলাম, কেউ ফাঁকি দিতে পারে নি, ফাঁকি দিলে তোর মতো জবরজং এক রাখহরি। মনে থাকবে ত'। দুনিয়াটা এক অদৃশ্য অজগরের বশ। তোর সে হুঁশ নেই, সারা জীবন বেটা চাষার মার খেয়ে মলি।

রুনু ফের বলেছিল, এই গোলাম মাথা গোঁজ করে বসে আছিস কেন। দুপুরে কত খাবি দেখব। পাঁঠার মাংস ভাত। দাদু ওকে আমি আজ খাওয়াব। ও কত খায়, খেতে পারে দেখব।

দিদিভাই তুমি হচ্ছ গে মা অন্নপূর্ণা। তোমার ইচ্ছেতেই সব।

গোলাম তখনই মুখ তুলে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণাকে দেখে বলেছিল, হ্যাঁ দিদিমণি থাকব। আমার বড় রাক্ষুসে খিদে। খেতে দিলে সব খাই। যা দেবেন লক্ষ্মি সব।

শ্রীনাথবাবু হাই তুলছিলেন। তুই কত খেতে পারবি রে বেটা। আমার কি বিদুরের ভাণ্ড যে তুই একমুঠো খেলেই ফুরিয়ে যাবে। তোর মত দশটা লোককে পুষতে আমার একটা কাঁঠাল গাছের কাঠই যথেষ্ট। সে যাক। অন্নপূর্ণার যখন ইচ্ছে হয়েছে থেকে যা।

গোলাম থেকে গেছিল।

দুপুরে পেটভরে খাইয়েছিল অন্নপূর্ণা। পাঁঠার মাংস ভাত। গোঁজ

হয়ে খেয়ে যাচ্ছে। ললিতা বলেছিল, দাদু-নাতিনের ভীমরতিতে ধরেছে। দাদু-নাতিন একসঙ্গে বসে গোলামের খাওয়া দেখছিল। কেউ জানে না সেই থেকেই রুনু ওর কাছে অন্নপূর্ণা। ওর খাওয়া নিয়ে, পেটভরা নিয়ে ভাবনা। বছর দুই হল শান্তিনিকেতনে পাঠিয়েছে। কিন্তু বাড়ি এলে কিছুতেই রুনু আর যেতে চায় না। এই এক ভুশুণ্ডি চরিত্র তার।

জ্যোৎস্না রাতে উবু হয়ে একটা লোক তখনও খেয়ে চলেছে। পূর্ণ ঠাকুর দশখানা বাসি রুটি দিয়েছিল। রুনু যখন দেখল, প্রায় আটখানা শেষ করে আঙুল মুখে পুরে গোলাম চাটছে, তখন একলাফে বাড়ি, এবং একতলার সদর রান্নাঘর থেকে ক'খানা চাকর বাকরদের রুটি তুলে নিতেই পূর্ণ ঠাকুর হাঁ হাঁ করে উঠেছিল। রুনুর সোজা কথা, আমি খাব। আমি খাব বললে কথা থাকে না। এ বাড়ির নিয়ম-কানুনই আলাদা। নাতিনদের অপ্রাপ্য কিছুই নেই। এ-ত সামান্য ক'খানা রুটি। তার আবার কাজ বেড়ে গেল। চারজন জোয়ান মুনিষ রাতে খায়। পূর্ণ খায়। টুনে হালদার খায়। এই ছ'জনের রুটি থেকে রুনু খাবলা মেরে দু'হাতে তুলে নিয়ে গেছে। সরকারী ডাল রয়েছে গামলা ভর্তি আর কাঁঠালের তরকারি। সবই করা হয়ে যাওয়ার পর এই টানাটানিতে পূর্ণ ঠাকুরের কাজ বেড়ে যেতেই সোরগোল তুলবে ভেবেছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে বড়কর্তাকে নিয়ে বিভ্রাট গেছে। আবার ক'খানা রুটি নিয়ে নালিশ জানালে ছোটবাবু রাগ করতে পারে। একটু বেশি কাজ হলেই দেখছি তোমাদের মাথা গরম হয়ে যায় পূর্ণ। ফলে সে চুপচাপ হজম করে গেছে। রুনু দিদিমণি রুটি নিয়ে কি করবে তাও জানে। গোলাম তবে এই বাড়ির কোথাও বসে আছে। যেটা দাগী চোর। চোর ছ্যাঁচোড়কে বাড়িতে পুষে রাখা হয়, এ-বাড়ি না এলে টের পাওয়া যায় না।

আর তখন জ্যোৎস্নায় রুনু ছুটছে। শরীরের শির শির ভাবটা আবার নড়েচড়ে উঠছে। আসবার সময় বলে এসেছে, খাবি না, দুটো রুটি আছে। খেয়ে ফেললেই ফুরিয়ে যাবে। আমি এলে খাবি।

গোলাম বুঝতে পারে দিদিমণি তার জন্য কিছু আনতে গেছে। কি আনবে বুঝতে পারছে না। মা-ঠাকরুণের ঘরে নানাবিধ সুঘ্রাণ-যুক্ত খাবার থাকে। এবার রুনু দিদিমণি আস্ত একখানা আমসত্ত্ব দিয়ে বলেছিল, আমার সামনে বসে খা। দেখি। এখন যদি আর এক বাটি মাংস নিয়ে আসে। সে আশায় আশায় বসে আছে। আর আঙুল চাটছে। চাটতে চাটতে প্রায় যখন ছাল চামড়া তুলে ফেলার যোগাড়, তখনই সাদা পরীর মত রুনু দিদিমণি হাজির। হাতে ক'খান রুটি। বড়ই পুলক বোধ হচ্ছিল গোলামের। খাবার দেখলে কুকুরের মতো লেজ নাড়ার স্বভাব। সে তো আর কুকুর নয়, যে লেজ থাকবে। তবে যেভাবে তার মোহ বাড়ছে খাবারের প্রতি তাতে করে রুনুদির কাছে একটা লেজ গজিয়েও যেতে পারে। আপাতত লেজ নেই বলে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসছে। আর একটু জোরে হলেই ঘেউ ঘেউ হয়ে যেতে পারত। তবে সময় লাগবে। রুনু একখানা করে রুটি হাতে ঝুলিয়ে রাখছে। সবটা একসঙ্গে দিচ্ছে না।

আবার আর একখান রুটি। গোলাম তাকিয়ে আছে। রুটিটা ওপরে তুলে দোলাচ্ছে রুনু। সে উবু হয়ে বসে দেখছে। পাতে না পড়লে সে হাত দিতে পারে না। সে উঠে এখন সব কটা কেড়ে নিতে পারে। কোন্ দিন না জানি তা করেও বসবে। এই ভয় আছে। এবং জানে হাত থেকে ছিনিয়ে নিলে তার রক্ষা নেই। কান ধরে ওঠ-বোস করাবে। হাত দিলেই জ্বালা। পিটুনি কনক রুজের দোকানের মত। ভয়ে ভয়ে সেজন্য তার বড় নিবিড় মনযোগ। খাইয়ে মানুষ। রুনুদিদিকে সেজন্য ভারি ভয় পায়। তার এখন একটি প্রভুভক্ত কুকুর হয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। রুনুদির একখানা রুটি, আর নিচের চাট মাংস মুখে দিয়ে বসে আছে। রুনুদি আবার আর একখানা দোলাচ্ছে। গোলামের ঘাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে দোলাচ্ছে। গোলামের শান্ত শরীর, আর রুনু দিদিমণির নরম প্রজাপতির মতো এক পাখনা, সেই যে এক অজগরের কিংবা বাঘের চোখে থাকে না, বড় এক ঘোর,

ঘোরে পড়ে গেলে কেউ আর নড়তে পারে না, সে হরিণই হোক, কিংবা শশকই হোক, অজগরের চোখে পড়ে গেলে নড়তে পারে না, গোলামেরও হয়েছে সেই দশা।

১০

খেতে বসেই আবার কথাটা উঠল।

ধীরেন ছোট মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, ঘেরিতে নাকি অজগর বের হয়েছে।

রুনু বলল, কুশল তাই বলল।

তোমরা আর ঘেরিতে যাবে না। এই বলে সে নরম মাংসের টুকরো মুখে ফেলে দিল।

গুল। রুনু ভাত নাড়াচাড়া করতে করতে বলল।

রুনু এইমাত্র বাথরুম থেকে স্নান সেরে এসেছে। শরীর ঠাণ্ডা। শির শির ভাবটা নেই। শির শির ভাবটা দেখা দিলে তার রোমকূপ ফুলে ওঠে। মাঝে মাঝে ধীরেন ললিতা এটা লক্ষ্য করেছে। গোলামের খাবার সময় কি যে বাই মেয়েটার সামনে বসে থাকা চাই। রোজ যে এমন হয় তা না। কোন কোন দিন। এবং দেখতে পায় গায়ে চাকা চাকা দাগ। এলার্জি হলে এটা হতেই পারে। রুনুকে বললে, সে বলেছে, ও কিছু না। বরং ভীত চোখ মেয়েটার। বাবা-মা টের পেয়ে গেলে ভীষণ একটা কাণ্ড হবে। গোলামকে তাড়িয়ে দিতে পর্যন্ত পারে। সেই ভয়ে তখন সে ছুটে পালায় এবং একটু ঘোরাঘুরি করে এসে বাবাকে হাত তুলে দেখায়। কৈ, কোথায়।

ধীরেনও তখন অবাক হয়ে যায়। কোথাও তখন আর চাকা চাকা দাগ নেই। রোমকূপ ফোলা থাকে না। অন্যমনস্ক হলে শরীর স্বাভাবিক আকার ধারণ করে। তখন ধীরেনের চোখকেই বিশ্বাস হয় না। যেন ভুল দেখেছে। যাই হোক খেতে বসে পরিপাটি মুখচোখ

ঝুমুর। সে বলল, বাবা গুল। ঘেরিতে অজগর আসবে কোত্থেকে। অজগরের বুঝি খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই।

ঘেরিতে অজগর বের হতে পারে না, কিংবা গুল ধীরেনের এতটা অবিশ্বাস নেই। হিজল বিলে শ্বাপদেরা যে এখনও নেই, তারা সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, ঘেরি করতে এসে মানুষজন সব উজাড় করে দিয়েছে এতটা অবিশ্বাস তার নেই। কারণ দু-এক জায়গায় উঁচু ডাঙ্গা জমিন, হিজলের বন, শ্যাওড়ার গভীর জঙ্গল আর উলুখড়ের দিগন্তবিস্তৃত ঘাসের জমি আর শীত গ্রীষ্মে পড়ে থাকে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি। গরু চরাতে যে-সব রাখাল আসে দূর গাঁ থেকে তারাও জানে এই প্রকৃতির লীলা রহস্যের মধ্যে তেনারা থাকবেন বেশি কি। এই ক' বছর আগে বান-বন্যায় যখন সব ভেসে গেছিল, মাঠ-কোটা, ঘরবাড়ি হিজলের তরাসি বন্যায় ভেসে গিয়েছিল, তখন ইস্টিশনটা আর এই বাগানবাড়িটা ছিল শুধু জেগে। অশ্বত্থ গাছের ডালে হিস হিস শব্দ। রাতেই শুনেছিল কেউ কেউ। তখন মানুষের মাথায় মরণ কামড়। কে কোন্ ডাঙ্গায় উঠে যাবে, বন্যায় সাপে-মানুষে বাস এমনিতেই হয়ে যায়। তখন দুটো বিশাল অজগর অশ্বত্থর গোড়ায় নেমে আসবে বেশি কি। ধীরেন জানে তার বাবা এককালে শিকারে ওস্তাদ মানুষ। তিনিই সাবাড় করেছিলেন দুটোকে। তারপর গোলাম টুনে আর সব গ্রাম্য মানুষ মিলে ও দুটোর মাংস আলগা করা থেকে চর্বি সংগ্রহ করা। কারণ মহিম কবিরাজ এসেছিল শুনে, দুই অতিকায় বিশাল অজগরের প্রাণ বড়কর্তার হাতে গেছে। চর্বিটা বড় মূল্যবান বস্তু কবিরাজী ওষুধে। তিনি বিনা পয়সায় পুঁটুলিতে অমৃত বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। অজগরের ছাল দুটো অনেক দিন বৈঠকখানায় পড়েছিল। বাবা কেউ এলেই বান-বন্যার গল্প বলে অজগর দুটোর ছালের দিকে হাত তুলে বলতেন, এই হচ্ছে প্রকৃতি। পড়ে থাকে। হিস হিস করে। যারে খাবার তারে খায়। আমরা এর হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য ছোটাছুটি করি।

ধীরেন জানে বাবার এই রকমেরই কথাবার্তা। বয়স বাড়ার সঙ্গে বাবা বুড়ো হতে চান না। মাধুরী মাসি এই সেদিনও বাবার লাগোয়া ঘরে থাকত। মা'র কথা এখন ভাল করে মনে পড়ে না। সেই শৈশবে তার মনে আছে, বাবা বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, মৃগাঙ্ককে খবর দাও, নিয়ে যাবার আগে বড় বৌ-কে দেখুক। মৃগাঙ্ক কাকা বাড়িতে ঢুকতে পর্যন্ত পারত না তখন। শেষ দেখা মৃগাঙ্ক না দেখলে বড় বৌর আত্মা শান্তি পাবে না। এই ছিল বোধহয় ভয়। বাবা মাকে বড় বৌ ডাকত। তার মনে আছে মৃগাঙ্ক কাকা এলে বাবা বুকে জড়িয়ে হাউ হাউ করে কাঁদছিলেন।—ও আমাকে বড্ড ফাঁকি দিয়ে গেল মৃগাঙ্ক। ধীরেন এ দৃশ্য হজম করতে পারবে না বলেই পাশের ঝুল বারান্দায় ছুটে গেছিল। সেখানে দেখেছিল, মাধুরী মাসি একা দাঁড়িয়ে দাঁত খুঁটছে। আর সেই দিন থেকেই তার আক্রোশ কেন জানি। সে বড় হয়ে ভেবেছিল, মাসিকে বাড়িছাড়া করবে। কিন্তু যখন সে সত্যি বড় হল, বিয়ে করল, তখন নিজেই বুঝল, আরও একটা অজগর আসছে ধেয়ে। অথবা নিজের মধ্যেই থাকে অজগর। একবার এম এল এ হয়ে, বন্ধু মেয়েকে চাকরি দেবে বলে বগলদাবা করে নিয়ে গেছে কলকাতায়। নানারকমের ফুর্তিফার্তা করেছে। শৈশবে যা মা'র প্রতি অবিচার মনে হয়েছিল, যৌবনে মনে হয়েছে তাই স্বাভাবিক। অজগরের গ্রাস থেকে কেউ মুক্ত হতে পারে না। মাসিকে এবং বাবাকে সে ক্ষমা করে দিয়েছিল।

মাসির অবশ্য একটা গুণ ছিল। নিরামিশাষী মানুষের যে সব গুণ থাকা স্বাভাবিক। একবেলা আতপ চালের প্রায় বলতে গেলে হবিষ্যান্ন। বিধবা হবার পর নিয়মকানুনের বান্দা। সকালে কিছুই খেত না। দুপুরে ঘি আতপান্ন আর সেদ্ধ এবং দুধ। রাতে দুধ খেত, ফলে মাসির মেজাজ ভারি ঠাণ্ডা। হেঁসেলে পূর্ণ ঠাকুর মাসিকে যমের মতো ভয় পেত। সব দিকে নজর। মাছ কার ক'টুকরা, রুটি ক'খান করে, দুধ কার বাটিতে কতটা সবই মাসির নির্দেশে হত। একফোঁটা

অপচয় তিনি পছন্দ করতেন না। সেদিক থেকে তার শরীরেরও অপচয় করেন নি। শেষ বয়স পর্যন্ত শরীরের যথোচিত ব্যবহার তিনি করে গেছেন। কোন আপসোস রেখে মরার বাঁদি তিনি ছিলেন না। এখনকার মত এত খাবার দাবার নষ্ট হলে পূর্ণ ঠাকুরের চাকরি যেত। অবশ্য নষ্ট হয় না। কারণ গোলাম একটা বাসি-পচার আস্তাকুড়। সে সব চেয়ে সাবাড় করে দেয়। পূর্ণ ঠাকুরও মনের আনন্দে খুশিমতো চলে। অবশ্য এ-বাড়িতে বাড়তি সব কিছু করতেই হয়। কেউ না কেউ খাচ্ছেই বাইরের। প্রায় হোটেলের সামিল। বাবাও কাউকে খাওয়াতে পারলে বড় খুশি। কোন পুকুরের মাছ, কোন ক্ষেতের পালং, কোন মাচানের লাউ-কুমড়ো, সব বাবা ব্যাখ্যা করবেন। এই এক জায়গায় বড় তাঁর অহংকার। পুকুর থেকে মাছ উঠলেই স্টেশনের বড়বাবু, ছোটবাবু সবার ঘরে টুনে দিয়ে বলবে, কর্তা পাঠাল। যে ঋতুতে যা, বড়কর্তা ঠিক পাঠিয়ে দেয়। এবং বড়কর্তার এই মেজাজে সবাই এত প্রসন্ন থাকে যে, প্রশংসা শুনতে শুনতে বিগলিত। এমন স্বাদ মাছের নাকি আর কোথাও পায় নি। এমন মিষ্টি কাঁঠাল, আর কি নরম কোয়া, আঁশ নেই, বলতে বলতে তারা চোখ বড় করে ফেলে। বাবার তখন বিস্তারিত খবর, কোথা থেকে বীজ সংগ্রহ করেছিলেন, কোথা থেকে কলম আনিয়ে-ছিলেন, এবং তিথি নক্ষত্র পর্যন্ত মুখস্থ বলে যেন শুনিয়ে দেওয়া এমনিতেই হয় না। বুঝলে, ভালবাসা চাই। এই ভালবাসা বিষয়টাই বোধ হয় গ্রাস করার সামিল। সব কিছু গ্রাস করা। ভালবাসলেই ত' শরীরের মায়া বাড়ে। বাবা দু' দণ্ড মাসিকে না দেখলে চোখে সরষে ফুল দেখতেন। শরীরের কিংবা গ্রাসের প্রয়োজনেই এটা হয়। যেমন একটা অজগরের মোহে পড়ে গেলে, জীবজন্তু আর নড়তে পারে না—বিষয়টা বাবা ঠিকই বলতেন। পড়ে আছি প্রকৃতির কূট খেলার মধ্যে, এর ভালমন্দ সবটাই তার।

ঝুনু ঝুনু দেখল তার বাবা বড় মনোযোগ দিয়ে মাংস চিবোচ্ছে।

বাবার গাল ফোলা, মুখ এত প্রবল যে বোঝাই যায় না মুখের ভেতরে কোন খাদ্যদ্রব্য আছে। বাবা অনেকক্ষণ কিছু কথা বলছে না। মাঝে মাঝে এটা হয় বাবার। খেতে খেতে কি ভাবে। ওরা অবশ্য ভাবছে, এখন হাত মুখ ধুয়ে যত তাড়াতাড়ি নরম সাদা বিছানায় শুয়ে পড়া। জানালা খোলা থাকবে। হাহাকার বাতাস ছুটে আসবে গঙ্গা থেকে। শোওয়ার আগে ছাদে কিছুক্ষণ পায়চারি করবে। কিন্তু রুনু বুঝতে পারছে না, শরীরে কেন বড় আলস্য। তার খেতে খেতে হাই উঠছিল। সে ওঠার মুখেই, বাবা বলল, কাল কাদের নাকি খেতে বলা হয়েছে রুনু।

কুশল, অমল। বড়বাবুও আসবেন। তুমি জান না? স্টেশনের বড়বাবু?

হ্যাঁ। স্টেশনের বড়বাবু। কে খেতে বলছে?

রুনু বুঝতে পারল না, বাবা তাকে এমন প্রশ্ন করছে কেন? রুনু বলল, জানি না।

বাবা বলে এয়েছেন?

কি জানি। ঝুনু বলল।

রুনু বলল, বোধ হয়। রুনুর বড় হাই উঠছিল। আসলে শরীরের ভিতর তার রক্তকণিকারা হাই তুলেছে। সে কি করবে।

ধীরেন জানে বাবার ওপর কথা নেই। কিন্তু একটা বিষয় আজকাল বুঝতে পারছে না, ললিতা কিছুকাল থেকেই তার সঙ্গে আর শুতে চাইছে না। অত্যধিক মোটা হয়ে যাবার ফলে এটা হতে পারে। সে অল্পতেই হাঁপিয়ে ওঠে। কিন্তু ললিতার আরও সময় লাগে। সেটা সে পারে না।

তা শরীর বলে কথা। সে তো আর কারো কথা শোনে না। ক্ষমতা বাড়াবার জন্য খাওয়া দাওয়া, মাছ-মাংস দুধ সবই হাতের নাগালে। তবে বেশি খেলে হজমও হয় না। বড় উদ্গার ওঠে। খাওয়া সামান্য শুরু হলেই দু'চামচ জোয়ানের আরক চাই। এটা অবশ্য ললিতা যত্ন

করে রেখে দিয়েছে টেবিলে। না খেলে মনে করিয়ে দিতেও কার্পণ্য করে না। সেই ললিতারই ইচ্ছেতে বড়বাবু এখানে বোধ হয় কাল খাবে। মানুষটি নবীন যুবক সুপুরুষ। নবীন যুবক অথবা সুপুরুষেরা খেলে ললিতা বড় তৃপ্তি পায়।

এ-সব বিষয় নিয়ে তার হামেশাই আজকাল চিন্তা-ভাবনা হয়। সব কিছু ঠিকঠাক রাখার জন্য, যার আর এক নাম মর্যাদা ধীরেন তার আগল খুলে দেবার জন্য প্রাণপণ লড়ে আসছে। সে যে ধীরেন, তার বাবা শ্রীনাথবাবু, ঘেরিতে হাজার বিঘের ওপর আবাদী জমি, মেয়েরা শান্তি নিকেতনে, গ্যারেজে জিপ, গঞ্জে ধানের পাটের আড়ত, একলপ্তে এতো, অর্থাৎ বিশাল সুন্দর অট্টালিকা, জ্যোৎস্নায় গাছপালা নিয়ে এক অরণ্য—সেখানে সে একজন শ্বাপদ, মাঝে মাঝে এটা মনে হয় তার, শীতল চোখ নিয়ে পড়ে আছে। শরীরে নানা রকমের চাকা চাকা দাগ দেখা দিতেই পারে। লোভ মোহ প্রবল হলে রক্তে দোষ দেখা দিতেই পারে।

এসময় ললিতা একবাটি দুধ নিয়ে এল। সঙ্গে সামান্য খেঁজুরের গুড়। সামান্য ভাত দিয়ে আর মর্তমান কলা দিয়ে চেখে চেখে খাবে ধীরেন। ললিতা দাঁড়িয়ে তাঁর আর খাওয়া দেখে না, আগে দেখত। সে বলল, ললিতা বড়বাবু কাল খাবে শুনলাম।

বাবা আসার পথে বলে এসেছেন। ললিতার কণ্ঠস্বর বড় ঠাণ্ডা।

তুমি ওকে ছাখনি। ধীরেন ট্যারচা চোখে বৌকে দেখল।

কি করে দেখব। সব বড়বাবুদের মতো তিনি ত' আর ইস্টিশনে নেমেই বাবার সঙ্গে দেখা কবতে আসেন নি। এলে নিশ্চয় দেখতে পেতাম।

ছাদ থেকে স্টেশনটা দেখা যায় না?

দেখা যাবে না কেন?

তোমার বাড়ির সামনেই ত' রেল কোয়ার্টার। দেখা যায় না?

দেখা যাবে না কেন?

না বলছিলাম, দেখা গেলে না দেখতে আর আপত্তি কি ! রুনু-ঝুনু নেই। একা পেয়ে ধীরেন স্ত্রীকে রসিকতা করছে। আসলে এটা রসিকতা না। কিন্তু ধীরেন যেন রসিকতা করছে এমন ভাবেই বলার চেষ্টা করল। ললিতা আজকাল এ-সব গ্রাহ্য করে না। কারণ ললিতা জানে, সে যদি অন্য পুরুষের সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হয় তবু ধীরেনের ক্ষমতা নেই কিছু করে। ধীরেন এক মিথ্যা অহঙ্কারের প্রাচীর দাঁড় করিয়ে বেঁচে আছে। আর যাই করুক সে মুখে চুন-কালি মাখাতে রাজি না। যেন ধীরেন বোঝে, বৌকে ধরে রাখার যার ক্ষমতা নেই, তার আড়তদার হবারও অধিকার নেই। টি আর প্রভৃতির মধ্যে মিছে টিপ-ছাপ দেবারও যোগ্য নয় সে। এই একটা ভয়েই তাকে অজগর হয়ে পড়ে থাকতে হবে। শুধু মাঝে মাঝে জিভ বের করা ছাড়া সে কিছু করতে পারবে না।

খেয়ে ওঠার সময় ধীরেন বলল, রবীনবাবু কেন আত্মহত্যা করলেন বুঝলাম না।

সেই ত'। বাবা তারপরই কেমন হয়ে গেলেন।

বাবা ছাদে উঠে গেছিলেন কেন ?

তাও জানি না।

বাবার কথাগুলি লক্ষ্য করেছ। কথার কোন সঙ্গতি নেই, কেমন সব অর্থহীন কথা। তারপরই রবীনবাবুর প্রেতাত্মা ধীরেনের সামনে মুখোস পরে নাচানাচি করতে শুরু করল। কেউ জানে না কেন কেউ কেউ আত্মহত্যা করে। সে সামান্য হেসে কি ভেবে বলল, আমরা বুড়ো হয়ে যাব যখন, তখন আবার অজগর সাপটা ঘেরিতে বের হবে মনে হয় ?

বুড়ো না হলে বুঝছি কি করে। কথাটায় ললিতা আদৌ গুরুত্ব দিল না।

সে-ই। ধীরেন উঠে পড়ল। তারপর নিচে নেমে দেখল, বাবা বড়বাবুর সঙ্গে গল্প করছেন। বাবার মুখ ভারি প্রসন্ন। ধীরেনের দিকে

তাকিয়ে বলল, শুনলাম বড়কর্তা নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। দেখতে এলাম।

ধীরেনের তখনই মনে হল, আজ বাবা পাখি শিকার করে ফেরার সময় তুটো খবরই জেনে এসেছিল, এক রবীনবাবুর আত্মহত্যা, তুই স্টেশনটা এখান থেকে সরিয়ে নেবে। তুটো খবরই বাবার কাছে মর্মান্তিক। তুটো খবরই বাবার কাছে অজগরের গ্রাস। কাজেই একটু অসুস্থ হয়ে পড়তেই পারেন। ধীরেন বলল, তাই।

বয়েস হয়েছে। সাবধানে থাকা ভাল।

ধীরেন বলল, কত বলি। কি দরকার ছিল ঘেরিতে পাখি শিকার করতে যাবার। রোদের কি তাপ বলুন। নাতনিরা একবার বললে আর রক্ষে নেই।

এই তো সম্বল।

শ্রীনাথবাবুর শুনতে ভাল লাগছে। তখনই বড়বাবু বলল, ঘেরিতে নাকি অজগর বের হয়েছে ?

শ্রীনাথবাবু ফের মুখ গম্ভীর করে ফেললেন।

ধীরেন বলল, আপনি কার কাছে শুনলেন ?

স্টেশনে কিছু লোক বলাবলি করছিল।

আর তখনই কনক রুক্স দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে হাজির।—শুনলাম ঘেরিতে অজগর বের হয়েছে !

শ্রীনাথবাবু সহসা ক্ষেপে উঠলেন।—কে তোদের আজগুবি কথা বলে ?

ঝুলবারান্দা থেকে ললিতা শুনতে পেয়েছে। সে তরতর করে নেমে এল. না বাবা, আপনাকে বার বার বারণ করছি, আপনি রুনু-ঝুনুকে নিয়ে ঘেরিতে যাবেন না। বর্ষার সময়। জলে ভরে আছে বিল। বিকেল হলেই নৌকায় মেয়েদের বিলে প্রমোদ ভ্রমণ। কালও যাবে বলছিল। কুশল, অমলকে নিয়ে যাবে। যদি আবার পাখি পাওয়া যায়। আমার কিন্তু বাবা ভীষণ ভয় লাগছে।

আমি যাচ্ছি না। বড়কর্তা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বললেন কথাটা।

ধীরেন বলল, আপনি যাবেন না, রুনু-ঝুনু যাবে ?

তারাও যাবে না। তবে তোমরা অজগরের ভয় কর না। সেই সব শ্বাপদ কবেই শেষ হয়ে গেছে। নতুন জমানায় এদের আর বোধ হয় রাখা হবে না। দেখছ না কি-ভাবে মানুষ গাছপালা সব কেটে সাফ করছে। বন কেটে বসত বানাচ্ছে। উদ্বাস্তুতে দেশটা ছেয়ে গেল।

তা হলে আরতি কুশল দেখল কি করে ?

আচ্ছা বৌমা, তোমরা কি সবটা শুনেছ। নাকি সবটা না শুনেই বলছ। কুশল কাল এলে জিজ্ঞেস কর। সেই সব বলবে।

কুশল পরদিন তবে আসছে। কুশল এলে সবটা ধীরেনও জেনে নেবে। কারণ বাড়িতে দুই মেয়ে বড় হচ্ছে। কে আর জেনে শুনে বাড়ির পাশে অজগর পুষে রাখে।

১১

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠেই ললিতা টুনেকে ডেকে পাঠিয়েছে। নিচে চারখানা ঘর, লাগোয়া বিশাল বারান্দা। মোজাইক ফ্লোরে সাদা-কালো রঙের কারুকাজ। টুনের এক নম্বর কাজ ঘরদোর সাফসোফ করে ঠিকঠাক রাখা। কারণ শহর থেকে এস. ডি. ও, ডি-এম থেকে বি. ডি. ও. পর্যন্ত অফিসের কাজে এলে, এই বাড়িতেই ওঠে। এই নিয়ম হয়ে গেছে। গ্রামে ঢোকার পথে স্কুলবাড়ির লাগোয়া ডাকবাংলো ঠিকই থাকে। তবে সাহেব সুবোরা এলে ওখানে থাকে না। ধীরেনের সঙ্গে সবার বড় দহরম। বাবার মতোই প্রভাব। ওটা বাবার কাছ থেকেই শেখা। অন্নদান কর। বাড়িতে যে পাত পেতে খায় তার আর নিমকহারাম হওয়া সম্ভব নয়। কাজ উদ্ধারে এর চেয়ে প্রশস্ত উপায় আর বেশি কিছু নেই। এ বছর

সিমেণ্টের লাইসেন্স এবং দুটো বাসরুটের পারমিট দরকার হয়ে পড়েছে। হয়েও যাবে। যারা আসে, শুধু হাতে ফিরে যায় না। পুকুর থেকে বড় মাছ, এবং ঘানি ভাঙ্গা সরষের তেল সহ টাটকা শাকসব্জি যায় সঙ্গে। টুনের এটা এ-বাড়িতে দ্বিতীয় দফার কাজ। সুতরাং ললিতা ডাকতেই বুঝতে পারল, আজ প্রথম দফার কাজটাতে একটু বেশি মনোযোগী হতে হবে। লোকজন আসছে। মৃগাঙ্কশেখর, তার শ্যালক অধীর চক্রবর্তী আসছে। অধীর চক্রবর্তীর দুই মেয়ে আরতি নমিতা আসছে। তাদের বন্ধুরা আসছে। সারাদিন বড় রকমের গেঞ্জাম চলবে।

ধীরেন জানে, সবটাই অপচয়। এই অহেতুক খরচে তার মেজাজটা বিগড়ে যাবার কথা। কারণ মৃগাঙ্ক কাকা এখন ঠুঁটো জগন্নাথ। তার প্রভাব প্রতিপত্তি একেবারে শূন্যের কোঠায়। জমিদারী চালটাই আছে। আর কোন সম্বল নেই। মৃগাঙ্ক কাকার শ্যালক এক সময় সরকারী বড় অফিসার ছিলেন। অবসর নিয়ে এখানে বেড়াতে আসার প্রথম ফুরসত পেলেন। অবসরপ্রাপ্ত অফিসারের দুই কন্যাদায় থাকলে তাকে করুণা করা ছাড়া আর কিছুই করা চলে না। তবু সেই যে বলে না, মর্যাদা বলে কথা, জাঁকজমক বলে কথা, এইসব দেখাতে না পারলে ললিতার মানসম্ভ্রম থাকে না। সকালবেলায় সে ললিতার প্রশ্নে কপালে কুঞ্চন তুলে শুধু বলল, যাবে।

এক্ষুণি।

যাবে বলছি। এত তাড়াতাড়ির কি আছে!

আমার তাড়া না। তোমার মেয়েদের তাড়া।

ধীরেন বুঝতে পারল, সকাল বেলাতেই মেয়েরা উচাটন বোধ করছে। বাবার জন্য আর তাদের মন-কেমন করে না। সবই লীলা। তারই রহস্যময়তা মেয়েদের শরীরে টের পেয়ে, সে প্রণিপাত জানাল তার ভগবানকে। এত করে বড় করে তুলছি, এখন অপরের প্রতি অনুরাগ। বড়টা অবশ্য অন্য রকমের। সে গোলামের খাওয়া দেখা

ছাড়া কিছুতেই আর পুলক বোধ করে না। মাঝে মাঝে গুন্‌গুন্‌ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। তাদের শৈশবে, কিরণ মাস্টার হারমনিয়ামে সা-রে-গা-মা শেখাত। ঝুনুকে নাচ শেখাত। তখন ললিতা ভাবত তার দুই মেয়ে গাইয়ে নাচিয়ে হবে। কিন্তু। কিন্তু পরে বুঝেছে, যারা ধীরেন নামক এক ব্যক্তির ঔরসজাত, তাদের কিছু হবার নয়। তারা শুধ্‌ খেতে ভালবাসে। আর উড়তে ভালবাসে। ওড়ার জন্য ডানা পাকাপোক্ত করতে গেলে ভাল টিপ ছাপের দরকার। এই দরকার বোধেই মেয়েদের শান্তিনিকেতনে রাখা। সে বুঝতে পারল আজ মেয়েরা বেশ উড়বে। সুতরাং বাবা হয়ে তার কাজ এই ওড়ায় সাহায্য করা। সে অবিনাশকে ডেকে বলল, মৃগাঙ্ক কাকার বাড়ি যাবে। সবাইকে নিয়ে আসতে হবে।

ললিতা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বাড়িঘর ঝকঝকে করে ফেলেছে। কিছু গোলাপের কাটিং টবে, সুন্দর গন্ধযুক্ত ফুল বাতাস পেলেই দোলে, হাওয়ায় রেখে দেবার ব্যবস্থা করা হল।

বৈঠকখানায় নতুন ঝকঝকে কুশন, সেণ্টার টেবিল এবং ফুলদানীতে রজনীগন্ধার ঝাড়। বেল ফুলের লাইনবন্দী গাছগুলিতে জল ঢেলে প্রায় সবুজ ঝকঝকে করে বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল ললিতা। ধীরেন বিষয়ী মানুষ, ফুটানি তার পছন্দ নয়। ললিতার এটা ফুটানি এমন বলার অবশ্য সাহস নেই ধীরেনের, তার একটাই জ্বালা, বড়বাবু খাবে। এই প্রথম একজন বড়বাবু ললিতার বিয়ের পর কমবয়সী হয়ে এসেছেন। বড়বাবুর সঙ্গে বাবার দোস্ত হয়ে যায়। তবে রক্ষা, এই স্টেশন এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে কথা হচ্ছে। ধীরেন কিঞ্চিৎ বল পেল বুকে। ললিতা তার স্ত্রী, পরপুরুষে টান যতটা কষ্টের, তার চেয়ে বেশি কষ্টের একজন ভূতপূর্ব এম. এল. এ-র স্ত্রীর দুশ্চরিত্র হওয়া। আসলে ললিতা তার কদর বুঝল না। একবার অবশ্য ললিতাকে বিধানসভা ভবনে নিয়ে গিয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। ললিতা তারপরও বিশেষ পাত্তা দেয় নি। আসলে এই হয়।

ললিতা সকাল সকাল স্নান সেরে নিয়েছে। লালপেড়ে গরদ পরেছে। চুল এলো করা। বড় দীর্ঘাঙ্গী। চুলের বাহার আরও তীক্ষ্ণ। ভুরু প্লাক করা। এবং টানা টানা চোখ। এ-সব অবশ্য এক সময় ধীরেন খুব পছন্দ করত। কিন্তু আজকাল তার কাছে এ-সব একজন খানকির স্বভাব মনে হয়। সে ত' আর মেয়েমানুষ কম ঘেঁটে দেখে নি। ভুঁড়ি বেড়েছে বলে কদর ললিতার কাছেই কম, কিন্তু অন্যত্র তার আদর বেড়েছে। তারা বোঝে ভুঁড়ি না হলে টাকা পয়সা থাকে না। টাকা-পয়সা না থাকলে সম্মান বাড়ে না। তার কি দরকার, একটা যদি পুত্রসন্তান থাকত, তবু না হয় কথা ছিল, তাও নেই। সব ত' ললিতা আর তার তুই উড়ন্ত দেবীর জন্য করা। এই যে মিছে টিপ ছাপ সবই এক বরফ ঠাণ্ডা অজগরের গ্রাসের জন্য। আর তখনই মনে হল কুশল বলে কলকাতার ছোঁড়াটাকে জিজ্ঞেস করতে হবে ঘেরিতে সত্যি অজগর বের হয়েছে কি না। জিপ পাঠিয়ে পাকা কাজ হয়েছে।

সে তখনই হাঁক দিল, গোলাম।

গোলাম পুকুরপাড়ে পাকা কাঁঠাল খুঁজছে গাছে।

সে গাছের ওপর থেকেই সাড়া দিল, আজ্ঞে হুজুর।

তুই গাছের মাথায় চেপে কি করছিস ?

আজ্ঞে কাঁঠাল টিপছি।

গরুর জাবনা দিয়েছিস ?

আজ্ঞে দিয়েছি।

পাকা কাঁঠাল পেলি ?

শ্রীনাথবাবু ঘরে ঢুকছেন তখন। বৈঠকখানায় লাঠি ঠুকে ঠুকে হাঁটছেন। ধীরেন ডাকাডাকি বন্ধ করে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকল। কাল বাবার বিভ্রম ঘটার পর থেকে সত্যি যেন বুড়ো হয়ে গেছেন। চোখে অনিদ্রার ছাপ। বাবা কি সারারাত দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। আজ কিছু এমন ঘটনা ফাঁস হয়ে যাবে যার জন্যে বাবা আর বাবা থাকবে না।

ধীরেন বলল, বাবা শরীরটা আপনার ভাল নেই ?

ভাল থাকবে না কেন। ভাল আছি। অযথা তোমার দুশ্চিন্তা করার স্বভাব আছে। তারপরই বুঝতে পারলেন তিনি ঘরে ঢুকছেন লাঠিতে ভর দিয়ে। তাঁর পক্ষে এটা খুবই অস্বাভাবিক কাজ। তিনি লাঠিটা হাতের ওপর একবার গোপনে হাওয়ায় দোলাবার চেষ্টা করলেন। লাঠিটা যেন আগের মতো স্বাভাবিক নেই। সামান্য ভারি ঠেকছে। এবং অল্পতেই কপালে ঘাম জমে গেল। এটা কিসের ইঙ্গিত। তিনি তাড়াতাড়ি সোফায় গা এলিয়ে দিলেন। পাশে লাঠিটা দাঁড় করানো। চন্দ্রনাথ থেকে আনা এই বেতের লাঠিটার মুখটা মাথার ওপর এখন সাপের ফণার মত দেখাচ্ছে। তিনি তার নিচে বসেই বললেন, প্রকৃতির গ্রাস বড় ভয়ঙ্কর। সে চুপি চুপি কাজ সারে। এবারে খাওয়া-দাওয়াটা একটু কমাও। বাথরুমে যাও তো নিজেকে দেখতে পাও না।

ধীরেন যাই হোক বাবাকে সমীহ করে। বাবা কলকাতা শহরে গ্রে-স্ট্রীটে একটা বড় বাড়িও করে রেখেছেন। ভাড়াটেদের নিয়ে মামলা চলছে। মাঝে একবার ইচ্ছে হয়েছিল, এখানকার বাস ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে ওঠাই ভাল। কিন্তু মুশকিল, এই অঞ্চলের যা কিছু সবই বড় তার প্রিয়। বলতে গেলে একজন ক্ষুদে অধীশ্বর। ললিতা এবং মেয়েরাও একপায়ে খাড়া ছিল। কিন্তু ভিতরে অজগরের গ্রাস থাকলে সে কি করতে পারে।

আসলে কাল থেকে কয়েকটি বিষয় এ-বাড়ির মাথায় দুশ্চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছে। পর পর কিছু দুঃসংবাদ। রবীনবাবুর আত্মহত্যা, স্টেশন এখানে থাকবে কি সরিয়ে নেওয়া হবে তার তদন্ত, বাবার বিভ্রম এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হিজলের ঘেরিতে আবার অজগর। কাল থেকেই সব সময় ধীরেনের মাথায় এই অজগরটা পাক খাচ্ছে। সে বলল, বাবা ঘেরিতে আপনি তখন কোথায় ছিলেন ?

আর এ-সময়ে গোলাম মাথায় করে নিয়ে এল, বিশ-পঁচিশ সেরী

ওজনের এক পাকা কাঁঠাল। কাঁঠালের ভুর ভুর পাকা গন্ধে ঘরটা ভরে গেল। শ্রীনাথবাবু কাঁঠালটা দেখে বললেন, বৌমাকে বলিস্ এখন যেন ভাঙে না। খাওয়ার ঘরে যেন রেখে দেওয়া হয়। যারা আসবে তারা দেখুক শ্রীনাথ চাটুজ্যের গাছে কত বড় কাঁঠাল হয়।

ধীরেন ভাবল, বাবা কি তাকে উপহাস করে কথাটা বলছে। সে ফের বেশ জেদী গলায় বলল, আপনি তখন কোথায় ছিলেন?

আমি আবার কোথায় থাকব?

ওরা যখন দেখল, চিৎকার চেঁচামেচি করল না!

ওরা মানে কারা?

এই কলকাতার ছোকরাটা।

না, কিছু না।

তা হলে একটা ব্লাফার।

তাই হবে।

কিন্তু ঝুনু যে বলল, সত্যি দেখেছে।

ঝুনু বলেছে এ-কথা?

ডাকব। বলেই ধীরেন ডাকবার জন্য সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়ালে শ্রীনাথবাবু বললেন, ডাকতে হবে না। তা'হলে হয়ত দেখেছে। নৌকায় ফেরার সময় কুশল শুধু বলল, ঘেরিটা অজগরের বশ। সে অজগর দেখতেই পারে। আর প্রথম বোধ হয় দেখেছে। তাই বলেছে। দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে তোমার আমার মতো তারও ভুঁড়ি মোটা হয়ে যাবে।

বাবার কথা কাল থেকে প্রায় সবই সঙ্গতিহীন। ভীমরতিতে ধরলে যা হয়। বয়স হলে যা হয়। কথার লাইন ঠিক রাখতে পারে না। তার চিন্তা যদি ঘেরিতে সত্যি অজগর এসে হাজির হয় তবে তাকে নিধন করা দরকার। শুকনো দিনেও ঘেরি ছেড়ে সে যাবে না। এমন একটা আবাস তার আর মিলবেই বা কোথায়। এত বড় ঘেরি আর কার আছে। জলে ডাঙ্গায় বনে জঙ্গলে বিচরণ করার মতো

এমন সুযোগ-সুবিধাও আর কোথাও নেই। সে রাজনীতি করতে গিয়ে টের পেয়েছে, সে নিজেও একটা অজগর, তার বাবা আরও বড় অজগর। সে একবার একজন বিরোধী নেতাকে খুন করিয়েছিল। কারণ জানে ভোটে দাঁড়ালে তার কাছে সে হেরে যাবে। কিন্তু পরে বুঝেছে খুন করেও রেহাই নেই। তার প্রেতাত্মা ঘোরাফেরা করে। সে এবারে সেজন্য হেরে গেল। এখন শুধু তার সম্বল সে একজন ভূতপূর্ব এম এল এ। যত সত্বর সম্ভব আরও গুছিয়ে নেওয়া। জমি-জমা নামে নামে রেজিস্ট্রি করা দরকার। এক গোলামের নামেই রাখা হয়েছে যাট বিঘে জমি। গোলাম যদি বুঝতে পারে সে কত বড় অধীশ্বর তবে সেও এই বাড়িটার আর একটা শত্রুপক্ষ। টিপ-ছাপ দিয়ে সব করিয়ে নেওয়া এবং বাড়তি উচ্ছিষ্ট খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখা। আর তখনই সে আরও জোরে চিৎকার করে বলল, রুনু-ঝুনু এদিকে এস।

শ্রীনাথবাবু বললেন, ওদের ডাকছ কেন?

আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

মাথা খারাপের কি হল?

মাথা খারাপ হবে না? ঘেরিতে যদি অজগর দেখা দেয় মাথা খারাপ হবে না? আপনার কি, সময় পার করে দিয়েছেন। আমাদের কি হবে! আমাদের সামনে আরও কত লম্বা সময়!

ঠিক এ-সময়ে পর পর ক'টি সাইকেল আরোহী এসে গেটে ঘণ্টা বাজাল। ধীরেন উঁকি দিয়ে দেখল। সকালেই খবর পেয়ে বোধ হয় ওরা এসে গেছে। ধীরেনদার বিপদে-আপদে বড় উদ্বিগ্ন থাকে তারা। এরা আছে বলেই সে আছে। ওরা সব ছুটপাট করে ঢুকে গেল।

বলল, ঘেরিতে অজগর বের হয়েছে শুনলাম।

শ্রীনাথবাবুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে। যত্ত সব—বলে তিনি আর একদণ্ড বসলেন না। ওপরে উঠে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আরও আসে, কেউ ভাগের জমি চাষ নিয়ে, কেউ

বীজের ধান নিয়ে, কেউ সার, স্যালোর জল এবং আবাদের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে। শরিকী বাগড়া নিয়ে এল কেউ। সব বিবাদ বিসম্বাদ সেই মিটিয়ে দেয়। এইসব মিটিয়ে দেবার সময় সবাই জনগণ এবং ভোটার, সুতরাং সবাই তাঁর অধিগত, সুতরাং সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে, এই বিষয়টি সম্পর্কে সুচতুর হতে হয়। আর যদি সে জেনেই যায়, কস্মিনকালে এর ভোটপত্রে তার পক্ষে ছাপ পড়বে না তবে, আগুন লাগাও, ঘরবাড়ি পোড়াও। সবই ভারি সংগোপনে। কেউ তখন বলতেই পারে না কেন খড়ের চালে আগুন জ্বলে উঠল। ওরা তখনও বলাবলি করছে, কি করা যায় দাদা! বাঁশের বনটায় আগুন দিলে হয় না: যেখানে বেটা ঘাপটি মেরে থাকুক না একেবারে গড়িয়ে গড়িয়ে জলে এসে পড়বে।

আসলে বিষয়টিই পরিষ্কার নয় আছে কি নেই বিষয়টি এখনও স্থির হয় নি। বাবার কথাবার্তা সব বিদ্ঘুটে ধরনের। এই অসময়ে তার বাবা ফিলসপি মারাচ্ছে। মনে মনে বাপ সম্পর্কে 'মারাচ্ছে' কথাটাই উচ্চারণ করল। ঝুনু নিচে নেমে এসেছিল ডাক শুনে, এসে দেখল বাপের কিছু উচ্চিংড়ে বসে আছে। বিড়ি খাচ্ছে। সিগারেট খাচ্ছে। কেউ একবার কানকি মেরে তাকে দেখে নিল এবং সঙ্গেসঙ্গে পা ঝাঁকানি থামিয়ে দিব্যি গম্ভীর গলায় বলল, যেখানেই অজগরটা থাক আমরা দাদা খুঁজে বের করব

তখন কেউ দেখলই না জানালার ও-পাশে গোলামের একটা সদি চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। অন্য চোখটা জ্বলছে। এত বেলা হল তার এখনও পেট নিরন্ন।

ক্ষিদে পেলে সে কেমন অমানুষের মতো হয়ে যায়।

ওদের আনতে গেছে, শুনেই রুনু-ঝুনু সাজগোজ শুরু করে দিল। দু'জনেই আজ লম্বা সাদা রঙের সিল্কের ম্যাকসি পরেছে। চুল বব করা এবং দু'পাশে দুটো সোনার প্রজাপতি ক্লিপ আঁটা। হাতে শঙ্খের বালা। এবং শরীরের রঙের সঙ্গে ভারি কারুকার্যময় হয়ে ব্যালকনিতে ছুটে গেলে—যেন দুই অপ্সরা ছুটে যাচ্ছে। ভারি মনোরম গন্ধ শরীরে। মাঝে মাঝেই ব্যালকনি থেকে ঝুকে দেখছে কিছু। কলকাতায় নেই বলে, তারা কোন খবর রাখে না কত মিছে আজ অমল কুশল তাদের দেখলেই এটা বুঝতে পারবে।

ধীরেন আজ আর বাইরের কাজ রাখেনি। আড়ত থেকে দস্তিদারমশাই দেখা করতে এসেছিল, তাকে দিনের কাজ বুঝিয়ে দিয়েছে। অজগরের খবর নিতে যে ক'জন উচ্চিংড়ে এসেছিল, চা পেয়ে তুষ্ট হয়ে চলে গেছে তারা। ধীরেনকে অভয় দিয়ে গেছে। অঘটন ঘটলে তারা আছে। ধীরেনের জন্য তারা জান দিতে পারে? এমনও বলে গেছে।

ওদের আসতে একটু বেলাই হল। আসলে ওখানেও ছিল সাজগোজ। আরতি, নমিতা সারাক্ষণ আয়নায় দাঁড়িয়ে কানের মুখের প্রসাধনে ব্যস্ত। সদর দরজায় জিপ। মৃগাঙ্কশেখর ধুতি-কোঁচা মেরে, গরদের পাঞ্জাবি গায় সদরে তখনও হাঁকছে, কিরে তোদের হল। কুশল অমল বারবাড়ির কাছারি ঘরে আছে। সামনে গঙ্গা। প্রচণ্ড হাওয়া। সকাল আটটার আগে ঘুম ভাঙ্গে নি। বেশ একটা মনোরম জায়গায় বেড়িয়ে যাওয়া গেল। সারাদিন হৈ-চৈ। একটা না একটা লেগে আছে। গাঁয়ের রাস্তায় খুব রোয়াব নিয়ে হেঁটে বেড়িয়েছে কিংবা লম্বা কুশনে পা তুলে সিগারেট টেনেছে। সামনে সুন্দর ভবিষ্যৎ। সাতটা সেমিষ্টার হয়ে গেছে। নম্বর ভাল। টিপ-ছাপ

পড়ে গেলেই উড়ন্ত এক চাকি। দু-একটা জোনাকির মতো নমিতা আরতি আর ঐ মেয়ে দুটো, রুনু ঝুনু গাঁয়ে এমন চীজ এটা কুশলের খটকা লাগছিল।

অমল বলেছিল, দেখবে ত' কি খায়! সব টটকা।

ও-সবে হয় না। আসলে জিন। ওর দাদুটা বুড়ো বয়সেও সাঁতার কাটতে চায়। তা হলে বুঝতেই পারছ কি মাল ঘরে রেখে গেল। সোজা কথায় আগুন।

অমল বলল, কাল কাশবনে সত্যি তুমি অজগর দেখেছিলে?

ঝোপ-জঙ্গল তো। এই ধর না, তুমি ভীষণ একটা কিছু করছ। সম্বিত নেই ধরে নাও। তখন যদি কিছু গলা বাড়িয়ে থাকে, সহসা মনে হতে পারে অজগর। অভিজ্ঞতার অবশ্য প্রশ্ন। একটা নতুন অভিজ্ঞতা হল। যাই বল, এমন জ্বলন্ত চোখ আমি দেখিনি। অজগরের চোখ একবার কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। ফলে এই আর কি!

অমল লতাপাতা আঁকা কলার দেওয়া গেঞ্জি পরেছে। অমল একটু বেঁটে। শরীর সম্পর্কে খুঁতখুঁতে বাই আছে। মাঝে মাঝেই মনে হয় চুল ঠিক ব্রাস করা হয় নি। এই নিয়ে সে পাঁচ-সাতবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল পরিপাটি করে নিয়েছে। গেঞ্জিটা কেমন মানিয়েছে একবার প্রশ্ন করল কুশলকে।

কুশল বলল, খাব খাব করে ফেলেছ।

কুশল একটু বেপরোয়া। সে বার বার আয়নায় মুখ দেখে না। সে যে সুন্দর এ বিষয়ে তার যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয় আছে। সে যা পরবে তাতেই তাকে ভারি মানিয়ে যায়। অমলের মত উঁচু হিলের জুতো সে পরল না। সামান্য স্লিপার গলিয়ে বের হয়ে পড়ল।

অমল বলল, জুতোটা পাল্টে নিলে পারতে।

কুশল বলল, রুনু ঝুনুর দাদু নাকি অশ্বত্থ গাছের নিচে অজগর শিকার করেছিল। আমার বড় সখ, অজগরের চামড়ার একজোড়া

জুতো বানাব। পৃথিবীতে এটাই একমাত্র সখ যা আমাকে খুব কাতর করে রেখেছে। নিউমার্কেটে খোঁজাখুঁজি করে দেখলাম। দিতে পারল না, তবে বলেছে, এলে খবর দেবে।

এখানে দেখতে পার। অমল বলল।

এখানে কোথায়?

রুনু-ঝুনুদের বাড়ি।

সেটা নাকি চুরি গেছে। বলে, কুশল সিগারেট নিবিয়ে দরজার দিকে গেল।

কে চুরি করবে?

জানি না। কার এত দরকার পড়ে গেল। এস মেসোমশাই ডাকছে।

আসলে চাকরবাকরেরা পয়সার লোভে ঝেড়ে দিয়েছে। কি ভয়াবহ একটা চাকর আছে দেখেছ। একটা চোখ পোকায় খাওয়া। সারা মুখে গুটি বসন্তের দাগ। দানব যেন পুষে রেখেছে।

গাঁয়ে দরকার হয়। কুশল নির্বিকার হতে চাইল। গাঁয়ে পয়সাওয়ালারা সব সময় অজগরের নিঃশ্বাস টের পায়। এরই মধ্যে বাস। তার পরই কুশল ফিস-ফিস করে অমলের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, ঐ আসছেন নমিতা-আরতি একেবারে টুসটুসি।

বাইরে বের হতেই কুশল দেখল, ভেতরের সিঁড়ি পার হয়ে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে। ওদের দেখেই আরতি মুচকি হাসল। এইসব হাসির মধ্যে গূঢ় অর্থ থাকে। হাসি না দেখলে বোঝা যাবে না—পৃথিবীটা কত রূপ-রসে ভরপুর। চোখ একেবারে ধারাল অস্ত্রের মতো ঝন ঝন করছে। জিপে ওঠার আগে আরতি বলল, হ্যালো কুশল, রাতে ঘুম হয়েছিল?

খুউব।

আমার হয়নি।

কেন?

কি জানি। এই নমিতা তুই আর আমি পাশে বসব। শয়তান ছুটোকে বাবার পাশে দে।

অধীর চক্রবর্তী লম্বা পাইপ টানছিলেন। তিনি এখানে আসার সময় তাঁর পোষা কুকুরগুলি নিয়ে এসেছিলেন। এগুলি ছাড়া তাঁর কোথাও রাতে ভাল ঘুম হয় না। এখন যে যাচ্ছেন, সঙ্গে একটা না থাকলে যেন অধীর চক্রবর্তী কত বড়, ডাকসাইটে অফিসার ছিলেন তার প্রমাণ মেলে না। লম্বা বাঘের মতো কুকুরটা মাটি শুঁকছিল। তিনি ডাকলেন, গারবো উঠে পড়। গারবো উঠে পড়লে অধীর চক্রবর্তী উঠলেন। ড্রাইভারের পাশে গারবো, তাঁর পাশে তিনি নিজে। মৃগাঙ্ক আর আরতি নমিতা পেছনে। সামনে ছুই শয়তান ছোকরা। কাল থেকে আরতি, কুশলকে ফাঁক পেলেই বলছে, শয়তানটা ভারি পাজি। কুশল শুনে খুশীই হচ্ছে। শয়তান বললেই তার ভেতরে কামোদ্রেক হয়। লোকজনের সামনে বলছে বলে কিছু করতে পারছে না। একটু গোপনে পেলে যে কি হবে বলা যাচ্ছে না। শয়তান কথাটা এখন তার কাছে পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডের মতো।

গাড়িটা ধুলো উড়িয়ে যাচ্ছে। গাঁয়ের গরীব-গরবারা এই জিপ দেখলে গড় হয়। ধীরেনবাবুর জিপ। জিপে এখন লাস্যময়ী ছুই নারী। পাশে জমিদারবাবু মৃগাঙ্কশেখর। সামনে গারবো। জিভ গরমে বের হয়ে আছে। হা হা করছে।

সব চেয়ে মজার বিষয় হল, আরতি আজ শাড়ী পরেছে। কথা আছে, ওরা ওখান থেকে খেয়ে সাধুবাবার আশ্রমে যাবে। বিকেলে ফিরবে। রাতে খেয়ে ফিরতে হবে। এবং গঙ্গার পাড়ে বড় আম-কাঁঠালের বাগানে ঘোরাফেরার সময় যদি ছুর্লভ সুযোগ আসে। কারণ এখানে সর্বত্র নানারকম বাগ-বাগিচা, ফাঁকা মাঠ, ঝোপজঙ্গল। যুবক-যুবতীর জন্ত ঈশ্বরের খুব সুবন্দোবস্ত আছে এখানে।

আসলে জীবন এই ছুর্লভ সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। যুবতীরা এই সুযোগের অপেক্ষায় বালিকা থেকে যুবতী হয়। বিবাহিতরা

নতুন দুর্লভ সুযোগ খোঁজে, মানুষ কখনও একজন নিয়ে তুষ্ট থাকতে পারে না। সে বহুবল্লভ। নারীরা বহুবল্লভা। তা না হলে ধীরেন দেখতে পেত না, একজন যখন আত্মহত্যা করে অন্যজন দাঁত খোঁটে। বাড়িটাতে এখন সবার দাঁত খোঁটা চলছে। ধীরেন কর্তাব্যক্তি সত্ত্বেও টের পায় সংসারে ভোজের আসরে সে বাড়তি মানুষ আজ।

ওরা এলেই বাড়িটাতে হৈ-চৈ লেগে গেল। রুনু বুনু একেবারে পরী সেজে আছে। তারপর আবার নরম পাখির মাংস। এমন কি রুনুর মনেই নেই গোলাম বলে একজন দানব সকাল থেকে কাঠাল গাছে পাকা কাঁঠাল খুঁজছে। পেলেই জঙ্গলে বসে সাবাড় করবে। তারপর কাঁঠালের বোথা এবং উচ্ছিষ্টগুলি জার্সি গরুকে খাইয়ে দিতে হবে সযত্নে। দাদুর নজর তীক্ষ্ণ। পাখ-পাখালিতে খেলেও টের পান। তাঁর গাছের কাঁঠালে সবার লোভ।

নিজের ঘরে বসেই শ্রীনাথবাবু রুনু বুনুর উচ্ছ্বাস টের পান। কেন এত উচ্ছ্বাস বুঝতে কষ্ট হয় না। সংসারের সব কিছুই অন্যরা ভোগ করবে। কত আশার সব কিছু এখন কত অসার হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। রবীনবাবুর আত্মহত্যার মূলে হয়ত এমন একটা কারণ থেকে গেছে।

খাবার টেবিলে সবাই গোল হয়ে খেতে বসেছে। চিনেমাটির প্লেটে সরু চালের ভাত। বড়বাবু আসতেই ললিতা একবার বারান্দায় বার হয়ে দেখা করল। শ্রীনাথবাবু বললেন, আমার বৌমা। এই হচ্ছে অধীর চক্রবর্তী। চক্রবর্তী তোমার ভাই কুকুরটি সামলাও। ওটাকে বেঁধে রাখলে হত না। আমার খুব ভয় করে।

অধীর চক্রবর্তী বলল পায়ের কাছে পড়ে থাকবে। কাউকে কিছু বলবে না। তবে অশুভ কিছু টের পেলে ঘেউ করে উঠতে পারে।

এক নম্বর ঘেউ ললিতা বের হয়ে এলে।

দু-নম্বর ঘেউ স্টেশনের বড়বাবু ললিতার দিকে তাকালে।

তিন নম্বর ঘেউ শ্রীনাথবাবু আরতির চোখাচোখি হওয়ার সময়।

চার নম্বর ঘেউ গোলাম্ নিচ থেকে যখন ডাকল, রুনু দিদিমণি।

পাঁচ নম্বর ঘেউ, রুনু দিদিমণির মনে পড়ে গেল, গোলাম অভুক্ত আছে। সে চিৎকার করে বলেছিল, যাচ্ছি।

গোলামের নামে ষাট বিঘা জমি। কুকুরটার নাম গারবো। শ্রীনাথবাবুর মনে হল সাংসারিক বুদ্ধি তাঁর কম। কুকুর পুষলে আরও ভাল হত। গারবো নাম কুকুরটার। এই নামেও পঞ্চাশ-ষাট বিঘা জমি লিখিয়ে নেওয়া যেত। কারণ সেটেলমেন্ট বাবুদের টাকার বড় আকাল। এত বড় জরিপ হয়ে গেল, কার জমি কার নামে উঠে গেছে যদি সংসারে হিতৈষী লোক এটা বুঝতে পারত। তিনি কুকুরটাকে একপাশে রেখে খাচ্ছেন। তাঁর পাশে অধীর চক্রবর্তী মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছে। ছোঁড়া ছুটো কিছু জানে না যেন, তিনি লক্ষ্য করেছেন ছোঁড়াটা আরতির দিকে তাকালেই পায়ের নিচে কুকুরটা ঘেউ করে উঠছে। তাঁর ভয় হচ্ছিল, কখন না জানি ধীরেন অজগরের কথা তুলবে। বেশ শংকা মনে। ধীরেন খেতে বসেনি। আসলে সে শ্রীনাথবাবুর পর এ-বাড়ির দ্বিতীয় কর্তাব্যক্তি। আপ্যায়নের দিকটা তার হেফাজতে। সেও একবার নমিতার দিকে তাকালে, কুকুরটা ঘেউ করে উঠল।

শ্রীনাথবাবু বললেন, কুকুর বড় ডাকে। কাজ না থাকলে মশাই এই হয়।

অধীর চক্রবর্তী বলল, আজ আবার যাবেন নাকি!

তুমি আচ্ছা কুৎসিত মানুষ বাবা। আমি জানিনা কেন ছোঁড়া ছুটোকে ধরে এনেছ! সেই এক জীবজন্তুর জগতের কথা মনে পড়ে যায়। জার্সি গরুর বাছুর যখন যুবতী হয় তখন কি পাগলা করে মারে। মাঠে ছুটে বেড়ায়। ধরাই যায় না। আর হাম্বা হাম্বা করে ডাকে। কি চায় বুঝতে তার কষ্ট হয় না। মানুষের মেয়েরা বড় হলেও গন্ধ বের হয়। বড় গন্ধ পাচ্ছেন। পাখির মাংস পাতে পড়ায় সেই গন্ধ যেন আরও প্রবল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, আমাকে দিও না। তুমি জান আমি খাই না। তবু দাও কেন বুঝি না।

আজ খান না। দু টুকরো খেলে কিছু হবে না।

ললিতা চামচ এগিয়ে আনলে কেমন ক্ষেপে গেলেন শ্রীনাথবাবু। বললেন, আমি ত কবেই খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

নিচে কুকুরটা আবার ঘেউ করে উঠল। তুমি বড় মিছেকথা বল শ্রীনাথবাবু। লোভ ঠিক আছে। আসলে হজমের গোলমাল।

শ্রীনাথবাবুর ইচ্ছে হল, কুকুরটাকে কষে একটা লাথি মারে। কিন্তু যদি কামড়ে দেয়। পায়ের জোরও কমে এসেছে।

আর এ-সময়ই ধীরেন কুশলকে প্রশ্ন করল, তুমি কি কুশল সত্যি অজগর দেখছ ?

নরম মাংসের হাড় মুখে কুশলের লালায় ভিজে আছে মুখ। মুখের গহ্বরে লাল আভা। সে তাড়াতাড়ি সবটা খেয়ে ফেলল। তারপর বলল, ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হল অজগরের মতই পড়ে আছে।

কোন্ জায়গাটায় ?

কাশের জঙ্গলে।

কত বড় ?

সবটা দেখিনি। কিছুটা দেখেছি। মাথাটা একটা মানুষের মাথার মত মোটা।

সেত তবে বিশাল অজগর।

শ্রীনাথবাবু প্রায় কাঁপছিলেন রাগে। বললেন, দেখ ছেলে, আমি সব বুঝি। তোমরা ওখানটায় কি করছিলে।

জোঁকের মুখে নুন পড়ার মত কুশল সিঁটিয়ে গেল। সব না বলে দেয়। সে অজগর বলে সবটা ধামাচাপা দিতে চেয়েছিল। একজন মানুষ যদি এত ইতর হয় সে কি করে। বুড়ো মানুষ তুমি, কাশী চলে যাও না। বিশ্বনাথ সম্বল কর। তুমি কেন লুকিয়ে দেখছিলে আমরা কি করছিলাম। আরতির মুখ কেমন শুকিয়ে কাঠ। সে ভেবেই পায় না মানুষ যদি কিছু করে তবে এত দোষের হয় কেন।

সবাই চুপ। ধীরেনের রাগ হচ্ছিল অধীর চক্রবর্তীর ওপর। ইচ্ছে

করেই ত ছেলে দুটোকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে লোকটা। সময় হলে গাই-গরুর মতো পাল দিতেই হয়। তা বিয়ে দিয়ে দিলেই পার। পয়সার টানাটানি ত খুব একটা তোমার থাকার কথা নয়। তারপরই মনে হল বিয়েটাই সব নয়। সাময়িক আস্তানা। জানালা খোলা থাকে। জানালায় চোখ যাবেই। বাইরের গাছপালা বাতাসে দোল খেলে ঘরে আর কতক্ষণ মানুষের মন টেকে। ললিতা আজ বড়বাবুকে খুব খাওয়াচ্ছে।

ওরা মাথা নিচু করে খাচ্ছিল। এই প্রাসাদের মত বাড়িতে এই হচ্ছে। মানুষের ইট-কাঠ থেকে পুকুর বাগান সবই এই এক কেন্দ্র ভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকে। এবং তারপরে থাকে এক মহাগ্রাস। মানুষ গ্রাস করে মানুষকে, সাপ সাপকে। ছোট সাপ বড় সাপ খেয়ে বেঁচে থাকে, বড় সাপ খায় অজগরেরা। সর্বত্রই খাবার পালা চলেছে। এই থেকে কাউকে ঠকালে শেষ পর্যন্ত পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। গোলাম গাছে একটাও পাকা কাঁঠাল পায়নি। পূর্ণ ঠাকুর তাকে দেখেও আজ কিছু দেয়নি। সবার খাওয়া না হলে সে কিছু পাচ্ছে না। চোখ থেকে তার আগুন ঝরছে। খিদে পেলে সে কেমন অমানুষ হতে থাকে। আর তার মহাগ্রাস অলক্ষ্যে তখন পড়ে থাকে। সে নদীর পাড় ভাঙ্গে, বন্যা নিয়ে আসে। রোগ জরা ব্যাধি মৃত্যু তার করায়ত্ত। সেও বসে নেই। সেও এক বিশাল অজগর।

কেউ টেরই পেল না কখন আরতি এবং ঝুনু উঠে গেছে। ওরা খাবার পর রেকর্ডপ্লেয়ার চালিয়ে দিয়েছে। গমগম করে মিউজিক বাজছে। এমন সুন্দর খাবারের পর সুন্দর যুবার সংলগ্ন হয়ে থাকা কত আরামের। শ্রীনাথবাবু লাঠি ঠুকে নিচে নেমে যাচ্ছেন। তিনি যে চুরি করে দুজন যুবক-যুবতীর সহবাস দেখেছেন সেটা শেষ পর্যন্ত ফাঁস না হয়ে যাওয়ায় নিরুদ্বেগ। সংসারে ইজ্জতের বড় একটা মুখোশ কোন কাল থেকে তাঁর মুখে আটা। উপরে মিউজিক বাজছে। যা খুশি করুক। কারণ মহাগ্রাস তিনি টের পাচ্ছেন, এগিয়ে আসছে।

সে সর্বভক্ত। তার ঘরে ধীরেনের মেয়েরা। অধীর চক্রবর্তী এখন যা খুশি করতে পারে। তিনি দাবা খেলায় মন দেবেন ভাবলেন। বড়বাবু উপর থেকে নামলেই বলবেন, আসুন বসি। যদি না জানেন, শিখিয়ে নেওয়া যাবে। এমন নেশা লাগিয়ে দেবেন যে তখন কাজকর্ম শিকেয় উঠবে।

মিউজিকপর্ব শেষ হলে আবার হৈ-চৈ করে বের হয়ে পড়া। মাইল তিনেক দূরে সাধুবাবার আশ্রম। ধীরেনের জিপেই যাওয়া হবে। ধীরেন যতই মনে মনে গজগজ করুক সে তার মর্যাদা নিয়ে ব্যস্ত। সে তার প্রভাব এবং প্রতিপত্তি নিয়ে ব্যস্ত। আশ্রমে গেলে টের পাবে, ধীরেন নামক এক জীবের কত সেখানে দান আছে। ওটা দেখিয়ে দিতে পারাটাও কম কথা না। সঙ্গে ললিতাও গেল। বড়বাবুও গেল। ছোট জিপে গাদাগাদি আর মেয়েদের সুঘ্রাণের মধ্যে সাধুবাবা কখন চেপ্টে গেছে কে জানে। নদীর পাড়ে অশ্বত্থের বিশাল ছায়ায় যে যেদিকে খুশি ঘুরে বেড়াল। আর তখনই দেখা গেল দূরে কোন এক দানবের মতো কেউ মাঠের মধ্যে দিয়ে হেঁটে আসছে। কেউ বুঝতে পারছে না সে কে। অতিকায় বিশাল মানুষ রুক্ষ মাঠে এমন করে দাঁড়িয়ে থাকলে ভয় পাবার কথা। রুনু কেবল বুঝতে পারল গোলাম আসছে। সে রুনুকে না দেখলে পাগল হয়ে যায়। তারপরই মনে হল আজ গোলামের বোধ হয় খাওয়া হয় নি। পূর্ণ ঠাকুর ওকে না খাইয়ে রাখতে পারলে মজা পায়। আর যায় কোথায়, রুনুর শরীরে তখুনি চাকা চাকা দাগ ফুটে উঠতে থাকল। সে বলল, মা গোলাম আসছে। আমি ওর সঙ্গে বাড়ি যাচ্ছি। তোমরা কখন ফিরবে কে জানে। আমার এখানে আর ভাল লাগছে না।

সন্ধ্যা নামছে। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ কুসুমের মত লাল। ও-পাড়ের গাছ-পালার ফাঁকে উঠে আসছে। অধীর চক্রবর্তী সাধুবাবার সামনে একটা ফুলফল আঁকা আসনে বসে আছেন। দূরে শ্মশান। আগে এই মন্দিরের কাছেই ছিল, কিন্তু নদী পাড় ভেঙে এখানে চড়া

তৈরি করে শ্মশানটাকে বেশ দূরে নিয়ে গেছে। মন্দির থেকে কিছু দেখা যায় না। মৃগাঙ্কশেখর হেঁটে সেই শ্মশান ভূমির কাছে দাঁড়িয়ে। বড় অনিত্য সব। কিন্তু আশ্রমের গাছপালার ফাঁকে ওরা কে কোন দিকটায় আছে ঠিক টের পাওয়া যাচ্ছে না। বৌমা বড়বাবুকে ধীরেনের মর্যাদা কতখানি এই আশ্রমে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে। রুনুটা একা চলে গেল গোলামের সঙ্গে। সোজা গেলে বেশি দূর না। কিছু ধান-পাটের জমি, বাগ্দিপাড়া, তারপর পটলের ক্ষেত এবং শেষে সেই বিশাল আম-কাঠালের বাগানটা সুরু হয়ে যায়। সেখানে পৌঁছে গেলেই বাড়ির চৌহদ্দি পেয়ে যাবে রুনু। তা-ছাড়া গোলাম হচ্ছে এ সংসারে বড়-একটা অ্যালসেসিয়ান। ললিতার মনে হল, মানুষ যখন অ্যালসেসিয়ান হয়ে যায় তার চেয়ে নিরাপদ কিছু থাকতে পারে না। গোলামের সঙ্গে ঝুনুকে পাঠিয়ে দিলেও মন্দ হত না। সে যেতে পারছে না। কারণ অধীর মামা সাধুবাবার কাছ থেকে নিজে উঠে না পড়লে সে কি করে যায়। ধর্মবাক্য, মহাভারতের গান্ধারী, এবং বিচিত্রবীর্য নিয়ে সাধুবাবার সঙ্গে কি একটা বিতর্ক সুরু করে দিয়েছে। অমল কুশল এবং তিন মেয়ে এমন সাদা জ্যোৎস্না আর নিরিবিলি গাছপালা পেলে সামান্য চঞ্চল হয়ে পড়বেই। তারও এই চঞ্চলতা ছিল। এখনও আছে। সেও সব দেখবার নাম করে বেশ নির্জন একটা জায়গায় বড়বাবুকে নিয়ে চলে এসেছে। কতদিন পর এক আশ্চর্য মুক্তির স্বাদ। মানুষের গায়ে সুগন্ধ।

এখন গোলাম হাঁটছে। কথা বলছে না। ঝুনু বলছে, আমার মনেই ছিল না গোলম তুই খাসনি।

গোলাম খাবার চেয়ে খায় না। কারণ মানুষের ক্ষুধার কথা মানুষই জানে। সে চায় না। তার ক্ষুধা পেলে শুধু সমোহন হয়। এই ক্ষুধার জন্য কাঁচা বাতাবী লেবু চিবিয়ে খেয়েছে। গরুর জাবনা দেওয়া চান করানো, গোয়ালঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে পেট কটকট করছিল। তারপর বাজার থেকে ভুষির বস্তা এনেছে মাথায় করে। ক্ষুধায় পেট

কটকট করছিল। একটা কাজ সারছে আর একবার পূর্ণ ঠাকুরের দরজায় মুখ দেখিয়েছে। তারপরও যখন পূর্ণ ঠাকুরের বজ্জাতি, তোরে আজ দাঁড়া পাখির মাংস খাওয়াচ্ছি—হারামির কেবল খাব খাব। সারা দিন খেতে পেলে আর কিছু চাস না। খাবার মাগনা। দেখি কে দেয়। রুনু দিদিমণি কি সেজেছে। মনেই থাকবে না শালো আজ তোমার ক্ষুধা ভক্ষণ চলছে। সবাই সারাদিন বড় টগবগে হয়ে আছে। কে কার দিকে খেয়াল রাখে। এমনই ফাঁক বুঝে সে গোলামের উপর বেশ প্রতিশোধের স্পৃহা মেটাবার একটা ফন্দি পেয়ে গেল। তোর রুনু-দিদিমণি খাওয়ায়, দেখ এবারে কে খাওয়ায়। বুড়াবাবুর মন মেজাজ ভাল নেই। ওর লাঠি সম্বল হয়ে যাওয়ায় সব কিছু আজ থেকে অর্থহীন। আমি বেটা পূর্ণ ঠাকুর সব বুঝি। তোর নামে ষাট বিঘে আছে, আর আমার নামে ষোল বিঘে। বেটা ভেবে বসে আছিস, তুই আমার চেয়ে বড় জাঁদরেল। দেখ এখন কার হিম্মত। না চাইলে দেব না। তোর ঘাড় কত মোটা দেখব।

এমনই আড়াআড়ি আছে চাকর-বাকরদের মধ্যে। সরকারের বিধিনিয়মে কেউ পঁচাত্তর বিঘার ওপর জমি রাখতে পারে না। ধীরেন কর্তার এক বিঘে জমিও খোয়া যায় নি। দিন যত যাবে তোর মতো গোলামের দরকার আরও বেশি হবে। আসলে বেটা তুই ত্যাঁদড়। সব বুঝে না বোঝার ভান করিস। হাবা-কালা সেজে বেশ মজাসে রুনু দিদিমণির কুত্তা বনে থাকতে চাস। আসল উদ্দেশ্য তোর কি, আর কেউ না বুঝুক আমি টের পাই।

গোলাম তখনও হাঁটছিল। একবার শুধু পেট দেখাল রুনুকে। যেন উপত্যকার মত পড়ে আছে ঠাণ্ডা শীতল এক জঠর। সে লুঙ্গি পরেছে। আগে গামছা পরে থাকত। ললিতা কি টের পেয়ে ওকে দুটো লুঙ্গি কিনে দিয়েছে মোটা কাপড়ের। তাও মাঝে মাঝে ললিতা দেখেছে লুঙ্গির ভেতর দিয়ে রৌদ্দুর ভেদ করে গেলে আবছা মতো একটা কিছু নড়ে। বাড়ির মেয়েরা বড় হয়েছে। এমন জোয়ান

মানুষের সব কিছুই বড় বেশি গোপন রাখা দরকার। এমন কি মাঠে-ময়দানে হাগা-মোতার বিষয়টিও গোলামের নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল ললিতা। তবু কি যে থাকে সেই শীতল উপত্যকার মধ্যে। রুনু মানুষের গভীর বেদনা টের পায়। সে গোলামের পেটটা ছুঁয়ে দেখতে চাইল। আসলে এক গভীর আকর্ষণ কারণ সে তার কাছে অরণ্যদেব। রুনুর খুশিমতো সে সব কিছু এনে দেয়। দরকার হলে, সে হিজল বিলের গভীর জল সাঁতরে নিশীথে কদমফুল এনে দেয়। ভোর হলেই রুনুব কদমফুল দরকার। মাইলের পর মাইল সেই জল রাশি। সারারাত সাঁতরে রুনু দিদিমণির জন্য সে কদমফুল নিয়ে এসেছিল। এই ভাবেই সে এনে দিয়েছে স্থলপদ্ম। সাপের রাজত্ব থেকে এনে দিয়েছে কেয়াফুল। কারণ এই মানুষের পাশাপাশি থেকে রুনুর মধ্যেও জন্মে গেছে এক আদিম বন্য স্বভাব। এই স্বভাব ঠেকাবার জন্যই শান্তিনিকেতনে পাঠানো।

রুনুর কেন জানি খুব রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। অমল বলে ছেলেটা বড় ট্যারচা চোখে আজ তাকাচ্ছিল। সে কেমন বিহ্বল ছিল সারা-বেলা। তার যে একটা আদিম বন্য মানুষের জন্য আলাদা মায়া আছে টেরই পায় নি আজ! এখন নিজের কাছেই বড বেশি অপরাধী ঠেকছে। সে যা কোনদিন করে না, আজ তাই করে বসল। বন্য মানুষটাকে বলল, এই আয় ছুটি। আর ছুটতে গিয়েই পড়ে গেল রুনু। গোলাম সঙ্গে সঙ্গে তুলতে গেল। এবং দু' হাতে একটা পদ্ম-লতার মতো বুকে তুলেজড়িয়ে ধরতেই রুনু ভয়ে চিৎকার করে উঠল, এই তুই কি করতে চাস। নির্বোধ মানুষটা কি করতে চায় জানে না। সে আরও কি সব করতে গেলে আজ মনে হল, গোলামের অন্য ক্ষুধা জেগে গেছে! এত বড় দানবের ক্ষুধা মেটাবার শক্তি রুনুর নেই। সে চিৎকার করে উঠল, না না। গোলাম আমি চিৎকার করব। বাবাকে বলে দেব।

রুনুর চিৎকার শুনে গোলাম একটা ছাড়া বাড়ি দেখতে পায়।

পরিত্যক্ত এক বাসভূমি। চারপাশে বড় বড় বর্শা নিয়ে কারা তাকে হত্যা করতে আসছে। সে আরও জোরে—যেন ক্ষমা ভিক্ষা, দিদিমণির মুখ বুকে ঠেসে ধরল। আসলে বলার ইচ্ছা দিদিমণি কিছু বল না। তোমার পায়ে পড়ি। আমার আবার কি যেন নতুন একটা সম্মোহন হল যে। কিন্তু রুনুর মনে হচ্ছিল গোলামের হাতের বিশাল থাবার মধ্যে সে ডুবে যাচ্ছে। মুখ খুলতে পারছে না। হাঁ করতে পারছে না। বুকের মধ্যে তার মুখ চেপ্টে গেছে। তার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। সে যত জোরে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছিল, তত গোলাম আরও জোরে—যেন ক্ষমা ভিক্ষা, দিদিমণি, না না। আমার দোষ হয়েছে। আমার মাথা কি ঘুইরে গেল! না, না, আপনি দিদিমণি কিছু···কিছু···কিছু···করেন না।

বেশ রাত করেই ফিরল জিপটা। ধীরেন দরজায় দাঁড়িয়েছিল। মনে মনে ভীষণ ফুসছে। এতটা সময় কি করছে সব। একবার গোলামকে খোঁজ নিতে পাঠাবে ভাবছিল। আবার মনে হয়েছে, এটা বড়ই ছোটমনের পরিচয় হয়ে যাবে। সে যেতে পারে নি। বাবা নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করার সময় বলেছিল, ধীরেন এদিকে শোন। কাছে গেলে বলেছিল, হাঁ করা গ্রাসের মধ্যে সবাই পড়ে আছে। সতর্ক থাকতে হয়। তোমার সেটার বড় অভাব আছে। অজগর শুধু ছিজলে নয়, তোমার আলজিভেও আছে! রক্তের সেই সম্মোহন থেকে যত সংযত থাক ততই ভাল। না হলে প্রকৃতি বড়ই অকরুণ হয়ে ওঠে।

বাবা এ-সব কথা আজকাল বড় বেশি বলছেন। সে এখন এ-সব গ্রাহ্যই করে না। তার আরও অনেক দরকার। যেমন এম এল এ হওয়া, মন্ত্রী হওয়া ফুলের মালা পাওয়া এবং হাজার মানুষ তার পায়ের কাছে গড় হবে, সে যা খুশি যেমন খুশি খাবে উড়বে। আর এক ধরণের রাজ্য জয়। এই রাজ্য জয় করতে গেলেই অর্থের দরকার। খোলামকুচির মত অর্থ ছড়াতে হয়। শুধু একটা জিপ-গাড়িতে সম্মান

থাকে না। চাই অ্যাম্বেসেডর, চাই বড় ব্যাংক ব্যালেন্স। চাই ভ্রমণ, চাই কাগজের পাতায় ছবি, চাই নাম, চাই যশ। অর্থই মানুষকে যশের শিখরে নিয়ে যায়। বাবা সেটা কাল থেকে আর বুঝতে চাইছেন না।

সবাই জিপ থেকে নামল। কিন্তু রুনু নেই।

ধীরেন বলল, রুনুকে রেখে এলে কোথায়।

নীলতা বলল, ও বারে ও তো গোলামের সঙ্গে সন্ধ্যেতেই ফিরে এসেছে।

এখন বাজে রাত দশটা। সোজা পথে ফিরতে আধঘণ্টাও লাগার কথা না। চরাচরে জ্যোৎস্না। ঘাটলায় বসে নাই ত। খোঁজ খোঁজ। না রুনু কোথাও নেই। এবং সঙ্গে সঙ্গে খবর আসল অজগর ধীরেনবাবুর মেয়েকে এতক্ষণে গ্রাস করে ফেলেছে। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলেন শ্রীনাথবাবু। লাঠি সম্বল করে দাঁড়িয়ে আছেন। কনক রুজু বলল, বলেছিলাম না, দাগী আসামী বাড়ি রাখবেন না।

আর তখন খোঁজাখুঁজি চলছে। বল্লম, বন্দুক, বর্শা হাতে সবার। অজগরটা কোথায় খুঁজতে গিয়ে দেখল পটলের খেতে রুনুর লাশ পড়ে আছে। আর সব ফাঁকা। একজন এসে বলল, হিজলের জলে একটা বড় অজগর ভেসে যেতে দেখা গেছে। জ্যোৎস্নায় কেউ কেউ নাকি অস্পষ্ট ওটা দেখেছে।